শ্রীমতী আর্ভের

তরু দত্ত

অনুবাদক :

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়



মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—চার টাকা—

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীভানু রায়
কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৩৭ বি বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীপ্রবোধকুমার পাল কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

শুধু অতীতের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস-ফেলা যেমন দুর্বলতা, তার ঐশ্বর্য-গরিমা সম্বন্ধে উদাসীন থাকাও তেমনি অক্ষমণীয় অন্ধত্ব।

পিছনের দিকে তাকালে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ-নির্দেশ ও প্রেরণাও কখনও কখনও পাওয়া যায়।

নূতনকে শ্রদ্ধানত ও নম্র করবার জন্যেই পুরাতন গৌরবকে তাই মাঝে মাঝে বর্তমানের কাছে তুলে ধরতে হয়। সার্থকভাবে এ কাজ যাঁরা করেন আমাদের কৃতজ্ঞতা তাঁদের প্রাপ্য।

শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে সেই কৃতজ্ঞতাই জানানো উচিত বলে আমার মনে হয়।

তরু দত্ত আমাদের এ যুগের অনেকের কাছেই কুহেলী-বাষ্পের মত অস্পষ্ট ধূসর একটি স্মৃতি। তাঁর নামের রেশটুকু সাহিত্যের দিগন্তে আছে ঘটে কিন্তু আসল মূল্যটুকু আমরা ভুলে গেছি।

পাশ্চাত্য-জগতের সঙ্গে আমাদের প্রথম সংস্পর্শ ও সংঘর্ষের সমুদ্র-মন্থনে হলাহল যেমন উঠেছিল, তেমনি অমৃতও কিছু। পশ্চিমের সংস্কৃতির সে অমৃতধারা পান করে যাঁরা এ দেশে নূতন এক রুচির সূচনা করে-ছিলেন, তরু দত্ত তাঁদের মধ্যেও অনন্যা। তাঁর হৃদয়ের ভিত্তি ভারতীয়, কিন্তু তাঁর চেতনার আকাশ সে যুগের সমস্ত আলোকিত পৃথিবীতে বিস্তৃত। তাঁর সে উদার চেতনার কাছে ভাষার বাধা পর্যন্ত নিরর্থক। তিনি যেমন সহজে ইংরাজিতে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, ফরাসীতেও তেমনি। সহজাত এই প্রকাশ-স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে মিলেছিল কোমল সজীব একটি বাঙালী মেয়ের মধুর শালীনতা। ফলে তাঁর গদ্য-পদ্য সমস্ত রচনাতেই ভারতের প্রাণের সঙ্গে ইউরোপের প্রেরণা মিলিত হয়ে একটি অশ্রুতপূর্ব সুর-সমন্বয় সৃষ্টি করেছিল।

শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তরু দত্তের ফরাসী ভাষায় লিখিত যে উপন্যাসখানি এখানে বাঙালী পাঠকদের জন্যে ভাষান্তরিত করেছেন, প্রায় এক শতাব্দী পরেও তার সে সুরের ইন্দ্রজাল আজও অক্ষুণ্ণ আছে কি না রসিক পাঠক তা পড়লেই বুঝতে পারবেন।

এ উপন্যাসের স্থান কাল পরিবেশ সবই হয়ত অচেনা সুদূর লাগতে পারে। কাহিনীর ধারা-বিন্যাসও হয়ত বর্তমানের রীতি পদ্ধতি থেকে ভিন্ন, কিন্তু এ সমস্ত ছাড়িয়ে ছাপিয়ে একটি সজাগ সূক্ষ্ম সুকোমল মনের এমন একটি সুরভি তার মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছে যা কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত পাঠকের মনকে অভিভূত করতে বাধ্য বলে আমার বিশ্বাস।

শ্রীমতী আর্ভেরের দিনপঞ্জী যেন কালের গুপ্ত-ভাণ্ডার থেকে বাব কবে আনা সুচারু-কারুকার্য-মণ্ডিত এক চন্দন-পেটিকা, অতীতেব অবর্ণনীয় আবেশ যা বর্তমানের হৃদযে কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত এনে দেয।

প্রাচ্যের ঐতিহ্য পশ্চিমের প্রসাধন পেযে তরু দত্তের রচনায় দুর্লভ দুঃসাধ্য এক ব্যঞ্জনায় পৌঁছেছে।

বিস্মৃতির যবনিকা সরিয়ে তরু দত্তকে যিনি আমাদের কাছে নতুন করে উপস্থিত করলেন তাঁর নিজেরও বিশিষ্ট একটি পরিচয় আছে। বাংলার অগ্নি-যুগের দুঃসহ দীপ্তি যাঁরা নিজেদের জ্বলন্ত জীবন দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য, বাঘা যতীন নামে চিরস্মরণীয, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর পিতামহ। পিতামহের নিষ্ঠা ও সাধনা পৌত্রের মধ্যে আর এক সার্থকতায পৌঁছেছে এইটিই আনন্দের কথা।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

"O dying voice of human praise !
        The crude ambitions of my youth,
I long to pour immortal lays !
        great pœans of perennial truth !
A larger work ! a loftier aim !......
        and what are laurel leaves and fame ?"

মূল ফরাসী উপন্যাস হইতে উদ্ধৃত। উপন্যাসের প্রকাশ-কাল—১৮৭৯ খৃঃ।
—প্রকাশক : Librarie Academique, Paris.

তরু দত্তের জীবনী ও রচনা

১৮৭৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী কলকাতা থেকে একটা চিঠি পাই—আমার প্রকাশকদের মারফৎ। এক ভারতীয় তরুণী আমার 'La femme dans I' Inde antique' "প্রাচীন ভারতে নারী" নামে বইটি অনুবাদ করবার অনুমতি চেয়ে এই চিঠি লেখেন। চিঠির সঙ্গে ছিল একটা বই : সুন্দর ইংরেজী কাব্যে অনূদিত ফরাসী কবিতার সংকলন : 'A Sheaf Gleaned in French Fields.'—একই সঙ্গে পাওয়া এই বই ও চিঠির লেখিকার বয়স অতি অল্প, তা সত্ত্বেও ইতিমধ্যে তিনি স্বদেশে ও ইংলণ্ডে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। নাম তাঁর তরু দত্ত। কলকাতার এক খ্রীষ্টান-পরিবারের—মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও সুপণ্ডিত বাবু গোবিনচন্দ্র দত্তের মেয়ে ইনি।

ভারতবর্ষ থেকে পাওয়া এই চিঠিই তরু দত্ত ও আমার মধ্যে যোগাযোগের প্রথম সূত্র। সে সংযোগ নিয়তির বিধানে বড় তাড়াতাড়ি ছিন্ন হল—এই প্রতিভাশালিনীর অকাল মৃত্যুতে। তাঁর লেখা সেই চিঠিগুলি (যা কলকাতা থেকে বাবু গোবিনচন্দ্র দত্ত পরে প্রকাশ করেন, 'এ শীফ গ্লীন্‌ড ইন্ ফ্রেঞ্চ ফীল্‌ড্‌স'-এর পরিবর্ধিত সংস্করণে), তাঁর মৃত্যুর পর আমায় লেখা শোকাচ্ছন্ন পিতার চিঠিগুলি আর তরু দত্তের কবিতার বইয়ের নতুন সংস্করণে সংযোজিত তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী থেকে যে তথ্য পেয়েছি ও তার সাহায্যে আমার মনের পটে সত্যিকার অসামান্য এক ব্যক্তিত্বের যে কয়েকটি মাত্র রেখা ফুটে উঠেছে, সেই রেখা ক'টি আজ পুনরুদ্ধার করাই আমার উদ্দেশ্য।

১৮৫৬ সালের ৪ঠা মার্চ তরু দত্ত কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৯ সালে সপরিবারে তাঁর বাবা ইউরোপে আসেন ও চার বছর এখানে কাটান। তরু ও তাঁর দিদি অরু মাস কয়েক ফ্রান্সের একটি ছাত্রাবাসে

থাকেন। তারপর ইংল্যাণ্ডে গিয়ে কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট কোর্স-এ তাঁরা বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেন।

তারপর গোবিনবাবু সপরিবারে যখন কলকাতায় ফিরে গেলেন, তখন তিনি তরুকে প্রাচীন ভারতীয় ভাষা সংস্কৃতে দীক্ষা দেন। তাঁর কন্যার পাঠ-সহচররূপেই তাঁকে আমরা সর্বদা পাই। চমৎকার একটি পারিবারিক চিত্রে তিনি দেখিয়েছেন মানিকতলা স্ট্রীটের পৈতৃক ভবনে কি ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁরা পড়াশুনোর মধ্যেই ডুবে থাকতেন।

তরুর প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "ও খুবই পড়তে পারত; তেমনি তাড়াতাড়িও পড়ত; কিন্তু পড়ার সময় কোনও দুর্বোধ্য অংশ বাদ দিয়ে যাওয়া ওর ধাতে সইত না। নানারকম অভিধান আর শব্দ-কোষ ঘেঁটে, শব্দের মানে উদ্ধার করে খাতায় তখুনি লিখে রেখে, তবে শান্তি। ফলে কঠিন শব্দ বা বাক্যগুলির মানে এমন সহজে ওর মনে গেঁথে যেত যে যখনই আমাদের মধ্যে কোনও তর্ক উঠত সংস্কৃত, ফরাসী অথবা জার্মান কোনও প্রয়োগ বা বাক্যাংশ সম্বন্ধে, দশ বারে অন্তত আট বার ও-ই জয়ী হত। এক এক সময় আমার এমন জিদ চেপে যেত যে আমি বলতাম, 'বেশ ত বাজি রাখা যাক!' বাজির অঙ্ক ছিল সাধারণত এক টাকা। কিন্তু যখন কেতাব ঘেঁটে অর্থের সন্ধান মিলত, দেখা যেত ও-ই বাজিমাৎ করেছে। ও কিন্তু যখন হেরে যেত, বড় মজা লাগত তখন ওকে দেখতে। প্রথমেই প্রাণ খুলে খানিক হেসে নিত, তারপর আমার গালে পড়ত মৃদু টোকা, সেই সঙ্গে ওর প্রিয় কবি ব্যারেট ব্রাউনিং-এর হয়ত কয়েকটি লাইন, 'হায় প্রিয়তম, বয়সে তুমি যে বড়, জ্ঞানে তুমিই প্রবীণ, আর তুমি, তুমি যে পুরুষ!'—অথবা অন্য কোনও পরিহাস।"

পাণ্ডিত্যের কাছে সানন্দে মাথা নত করতে তরুর বাবা সদা-প্রস্তুত ছিলেন, এমন কি, নিজের কন্যার কাছেও তার ব্যতিক্রম হত না। এই সব কথা তাঁর কাছ থেকে বার বার শুনে আমার চোখে ক্ষণে ক্ষণে ভেসে

ওঠে তাঁর সন্তান-গৌরবে ধন্য পিতৃরূপ!

তরু দত্তের বাবা মেয়েকে ইউরোপীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় শিক্ষিত করে তোলেন,—এখানেই আমরা দেখি ভারতের ওপর—মায ব্রাহ্মণ ও ইসলাম ধর্মের ওপর—খ্রীষ্টান সভ্যতার প্রভাব কত সুন্দর। মঁসিয্য গারসাঁ্য দ্য তাসি-র মতে, "ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান ও পার্সীরা নিজেদের খরচেই ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ইস্কুল খোলে, কেবল ছেলেদের নয়, মেয়েদের জন্যও। আজ অবধি এমন তাজ্জব কথা বড় শোনা যায় না!"*

তরুর কিন্তু ইতিহাসেব দিকে তেমন টান ছিল না। একদিন লর্ড এল. …(লিটন ?) যখন কলকাতায় এঁদেব বাড়ি বেড়াতে যান, তখন অরুর হাতে একটা উপন্যাস দেখে সেটা কেড়ে নিয়ে দুই বোনকে তিনি বলেন, "উপন্যাস বেশি পড়া ভাল নয। ইতিহাস পড়া দরকার।"—তরু জবাব দেয, "লর্ড, উপন্যাসই আমাদেব বেশী ভাল লাগে।"—"কেন?" এই প্রশ্নেব জবাবে তরু সপ্রতিভ ভাবে হেসে বলে, "কারণ উপন্যাস হল সত্যি, আর ইতিহাস কল্পিত" ("Because novels are true, and histories are false."। এই ভাবে পরিহাসের মাঝেই সে বুঝিযে দিল একটা গোটা জাতেব—কাব্য-পরাযণ হিন্দু জাতের—রুচির দৃষ্টি-ভঙ্গি: ইতিহাস চাই না, চাই পুরাণ!

প্রাচীন সংস্কৃত কবিদেব প্রতি তরুর ছিল গভীর ভালবাসা। আমায লেখা তার ফরাসী একটি চিঠিতে সে বলেছিল, "মাদমোযাজেল, জানেন না, আমার স্বদেশের, আমার স্বদেশবাসীর প্রতি আপনার অনুরাগ (তার সাক্ষী আপনার বই, সাক্ষী আপনার চিঠি) কি ভাবে আমায বিচলিত করে তোলে। আমি দৃপ্তকণ্ঠে বলতে পারি, আমাদের

* মঁসিয়্য গারসাঁ্য দ্য তাসি ভারতের নারীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। শ্রীমতী মেরী কার্পেন্টারকে তিনি প্রাণে মনে শ্রদ্ধা করতেন ভারতের নারী-প্রগতি তে কার্পেন্টারের অক্লান্ত চেষ্টার জন্য।

মহাকাব্যের যে কোনও নারী-চরিত্র প্রত্যেকের শ্রদ্ধার পাত্রী, প্রত্যেক হৃদয়ের অমূল্য সম্পদ। সীতার চেয়ে করুণ, তাঁর চেয়ে প্রেমময়ী চরিত্র আমায় আর একটা দেখাতে পারেন? আমার ত বিশ্বাস হয় না। সন্ধ্যাবেলা যখন আমার মা আমাদের দেশের প্রচলিত গানগুলি গান, আমার দু চোখ জলে ভেসে যায়। দ্বিতীয়বার বনবাসের সময় সীতার বিলাপ, একাকিনী যখন তিনি বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, দারুণ হতাশা আর ব্যথায় মুহ্যমান—এ-দৃশ্য এমনি হৃদয়-বিদারক যে চোখের জল না ফেলে তা কখনও শোনা সম্ভব বলে আমার মনে হয় না।"—এই চিঠির সঙ্গেই তরু সংস্কৃত থেকে দুটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ আমায় পাঠিয়েছিল। তাদের স্বল্প পরিসরে যে তেজের পরিচয় পেয়েছিলাম তা অবিস্মরণীয়। বিষ্ণুপুরাণের দুটি কাহিনী: 'ধ্রুব,' আর 'রাজর্ষি ও মৃগ'!

আজন্ম মায়ের মুখে প্রাচীন কাহিনী শুনে, বাবার কাছে সংস্কৃত-পাঠের দীক্ষা পেয়ে তরু দত্তের কণ্ঠেও কি ধ্বনিত হবে শুধু তার দেশেরই বন্দনা? ভারতের দিগন্ত-বিস্তৃত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই কি তার বিষয়বস্তু হবে—যেখানে গহন অরণ্যে স্বীয় গরিমায় বিরাজিত অগণ্য বিটপী? সেকালের সংস্কৃত কবিদের মত সেও কি হরিণীর চঞ্চল গতিই অনুধাবন করবে একদৃষ্টে, দেখবে জড়োয়াখচিত মৌটুশকিদের লাস্য? বিশাল বনানীর বুকে, বিলম্বিত ন্যগ্রোধতলে শুনবে কি শুধু কোকিলের কুহু-মাধুর্য? নাগিনীর হিংস্র স্বনন? মৃগেন্দ্রের হুঙ্কার? বহু বর্ণের কমলশোভিত দীঘিতে সে কি শুধু কেলিমুগ্ধ মরালের পানেই তাকিয়ে থাকবে? নিদাঘের সূর্যতাপক্লিষ্ট পর্বতে পর্বতে ফেনময়ী তরঙ্গিণী তটিনীর চপল ময়ূখ কি সে বর্ণনা করবে, না কি বর্ণনা করবে উজ্জ্বল নীলকান্ত আলোকে স্নাত চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের হীরকচ্ছটা?

না! বাল্মীকি ও ব্যাস-উল্লিখিত দৃশ্যাবলী সামনে রেখে আমাদের এই ভারতীয় খ্রীষ্টান তরুণী ফিরে দাঁড়িয়েছে নিষ্প্রভ পাশ্চাত্ত্যের পানে,

যেখানে প্রাকৃতিক আকর্ষণ অনেক কম, কিন্তু মানুষের বহর অনেক বেশি। তাই, 'বিদেশী তরুণী'র প্রতি কবি শীলর-এর উক্তি একটু বদলে নিয়ে ওর কবিতার বইয়ের শেষে ও লিখেছিল, "যে-ফুল, যে-ফল আমি এনেছি, তা আর এক দেশের, আর এক সূর্যের আলোয়, আর এক লাস্যময়ী প্রকৃতির বুক থেকে চয়ন করা !"

'Ich bringe' Blumen mit und Friichte,
Gereift anf einer andern Flur,
In einen andern Sonnenlichte,
In einer gliicklichern Natur.

(শীলর-এর উক্তির প্রথমটা ছিল 'Sie brachte' Blumen···)

আমাদের ফরাসী কবিদের গানগুলি অনুবাদ করতে তরু বড় ভালবাসত ; কিন্তু, ইতিপূর্বেই বলেছি, এই ভারতীয় তরুণীটি আকণ্ঠ মগ্ন ছিল আমাদের সভ্যতায়, তাই সে এই গানগুলি বাংলায় অনুবাদ না করে করল ইংরেজীতে। ফলত, মঁসিয়্য গারস্যাঁ স্থ তাসির স্বনামধন্য লেখনী মাধ্যমে আমরা ভারতীয় মহিলা কবিদের নামের যে তালিকা পাই, সে-তালিকা বৃদ্ধি না করে তরু অধিকার করল তার আসন ইংল্যাণ্ডের কবিদের মাঝে।

কিন্তু আমাদের ক্লাসিকাল কবিদের কবিতা অনুবাদ করা এই তরুণী কবির উদ্দেশ্য ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দী ফরাসী কবিদের ধারণা ছিল যে ভাব আবেগ প্রভৃতির উচ্চে স্থান দিতে হবে মননশীলতাকে। কবিতা বলতে তাঁরা বুঝতেন একখণ্ড স্বচ্ছ স্ফটিক, যার সাহায্যে মানুষের চিন্তাধারা স্বচ্ছন্দে পড়া চলবে। কাজেই এই শতাব্দীর ফরাসী লেখকরা এই তরুণী কবির চিত্ত হরণ করতে পারেন নি। কারণ যে দেশ তাকে জন্ম দিয়েছে, সে-দেশে কবিতা মানেই ভাব, কল্পনা, আবেগ, আর সেখানকার প্রকৃতির মতই তা প্রাচুর্যমণ্ডিত। তরু সত্যিই যাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাঁরা উনবিংশ শতাব্দীর কবি। তাঁদের মধ্যেই সে খুঁজে

পায় তার স্বদেশবাসীদের অন্বেষ্টব্য : হৃদয়ের প্রতিক্রিয়ার তীব্র নাটকীয় প্রকাশ, উপমার যথেচ্ছ ব্যবহার, বর্ণের বিপুল সমারোহ। মঁসিয়্য ভিক্তর হুগোর প্রতি তরুর উচ্ছ্বাস দেখে তাই আশ্চর্য হই না। তার কবিতার বইয়ে প্রতিটি কবিতার তলায় তারই দেওয়া মন্তব্যে তাই সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছে : "একটি পাদটীকায়, ছোট কয়েকটি লাইনের পরিসরে ভিক্তর হুগো সম্বন্ধে মন্তব্য করা সতিই ধৃষ্টতা! পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অমর তাঁর নাম। শেক্‌স্‌পীয়র, মিলটন, বায়রন, গ্যেথে, শীলর প্রভৃতির সঙ্গে পাশাপাশি তাঁর আসন বহুদিন থেকেই প্রতিষ্ঠিত আছে কবিদের স্বর্গে।"

যদিও তরু দত্তের সক্রিয কল্পনাশক্তি ভিক্তর হুগোকে লামার্তিনের চেয়ে অনেক উঁচুতে তুলে ধরেছিল, তবু তার আধ্যাত্মিক সত্তা দিয়ে সে স্বীকার করে নিয়েছিল 'মেদিতাসিয়' ও 'হারমনি'-র কবির (লামার্তিনের) নৈতিক মহত্ত্ব : "মেজাজে, কল্পনায়, ঔজ্জ্বল্যে, উচ্চভাবে, স্টাইলে—কবিত্ব বলতে যা কিছু বোঝায়—একমাত্র পবিত্রতা ছাড়া—সব কিছুতেই তাঁকে ভিক্তর হুগোর কাছে মাথা নত করতে হবে। পবিত্রতায় তিনি অনন্য। তাঁর অন্তর স্বভাবতই আধ্যাত্মিক। সাধ্বী জননীর কোলে বসে যে শিক্ষা তিনি শৈশবে পেয়েছিলেন, তা তিনি কখনও ভোলেন নি। জননীকে তিনি তাই সহস্রবার স্মরণ করেছেন তাঁর লেখনীর সপ্রেম অর্চনায়।"

তারপর মঁসিয়্য লাপ্রাদ সম্বন্ধে তরু দত্ত লিখেছে, "লাপ্রাদ আর লামার্তিন হচ্ছেন বর্তমান ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁদের রচনাবলী গভীর, পবিত্র, আধ্যাত্মিক। দু জনেই তাঁদের গর্ভধারিণীর কাছে এ-বিষয়ে ঋণী। কারণ উভয়ের জননীই ছিলেন ভক্তিময়ী, প্রখর বুদ্ধিমতী আর আত্মত্যাগী (Woman of prayer, large-minded and self-denying)।"

লামার্তিন, ভিক্তর হুগো ও লাপ্রাদের সঙ্গে সঙ্গেই তরু দত্তের

অনুবাদে ও মন্তব্যে আমরা পাই সমকালীন প্রায় প্রত্যেক পার্নাসীয় কবির উল্লেখ ; বের্ঁাজের, লত্রঁা, ম্যুসে, ভিইঁনী, শ্রীমতী জিরারদ্যাঁ, স্যাঁৎ-ব্যভ, ব্রিজো, পঁসার, গোতিয়ে, ওত্রঁা, রবুল, বার্বিয়ে, ওজিয়ে, রাতিস্‌বন, লকঁৎ-দ্য-লীল, গ্রামঁ, মাহুয়েল, কোপে, ল্যমোইন, প্র্যুদম, সুলারী প্রভৃতির।

তরু দত্ত কেবলমাত্র ফরাসী থেকে অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হয় নি। তার উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী লেখিকা হওয়া। যে কয়টি পাণ্ডুলিপি সে রেখে গিয়েছে, তার মধ্যেই একটি মূল ফরাসীতে রচিত উপন্যাস পাওয়া গেছে : 'শ্রীমতী আর্ভের-এর দিনপঞ্জী'—যা আমরা আজ প্রকাশ করছি আর যার সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা করব।

তরু দত্ত কেবল আমাদের ভাষা ও সাহিত্যকেই ভালবাসে নি, আমাদের জন্মভূমিকেও সে ভালবেসেছিল নিবিড়ভাবে। ফ্রান্সের নিদারুণ দুর্যোগের ক্ষণে তার এই ভালবাসার পরিচয় আমরা পেয়েছি। তরু দত্তের বাবা কপি করে আমায় পাঠিয়েছেন অপ্রকাশিত কয়েকটি হাতে-লেখা-পাতা যার বুকে এশিয়ার এই দুহিতা, যখন পনেরো বছরও তার বয়স হয় নি, অমর করে রেখেছে আমাদের স্বদেশবাসীর দুর্ভাগ্যের কাহিনী এমনি করুণ ভাবে, যা দেখে কেউ বলবে না যে কোনও ফরাসী নারীর বুকের কথা তা নয়। তরু তখন লণ্ডনে ছিল। ওর বিদেশ-ভ্রমণের ডায়েরী থেকে—১৮৭১ সালের ২৯শে ও ৩০শে জানুয়ারীতে লেখা—একটু তুলে দিই এখানে :—

"২৯শে জানুয়ারী, ১৮৭১। লণ্ডন। ৯ সিডনি প্লেস, অনস্লো স্কোয়ার। —বহুকাল হল ডায়েরী লেখা ছেড়ে দিয়েছিলাম। শেষবার যখন এই ডায়েরী হাতে নিই, তারপর থেকে কত পরিবর্তনই না ঘটে গেছে ফ্রান্সে। হায় রে! ফ্রান্সে কতই না পরিবর্তন ঘটে গেল! কয়েক দিনের জন্য পারীতে যখন গিয়েছিলাম, কি রূপই তার দেখে এসেছিলাম। কি বাড়ি! কি রাস্তা! কি অপূর্ব সৈন্যবাহিনী! আর আজ? সব ধূলিসাৎ হয়ে গেছে! সব নগরীর রাণী যে ছিল, আজ তার এ কী দৈন্য! যুদ্ধ যখন

বেখেছিল, সর্বান্তঃকরণে আমি ফরাসীদের পক্ষই নিয়েছিলাম—তাদের পরাজয় সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকা সত্ত্বেও। একদিন সন্ধ্যাবেলায় যখন যুদ্ধ পুরোদমে চলেছে, উপর্যুপরি যখন ফ্রান্স পরাজিত হয়ে চলেছে, তখন ফরাসী-সম্রাট সম্বন্ধে বাবা কি যেন মাকে বলছিলেন—কানে এল। তীরবেগে নীচে গিয়ে শুনলাম, ফ্রান্স অধিকৃত।...তারপর আরো কত দুঃসংবাদ এল: পারীর বিপ্লব, সম্রাজ্ঞী ও যুবরাজের ইংল্যাণ্ডে পলায়ন, সম্রাটকে বন্দিরূপে উইলহেন্‌স্‌হোযের কাছে প্রেরণ, পারীতে জার্মান বর্বরতা, স্ট্রাসবুর্গে বোমা! বোমার মুখে কি দুর্দশা ওদের! বাড়ি-ঘর গুঁড়িয়ে গেল। চারিদিকে বহ্নি-লীলা!...

হায়! হাজার হাজার লোক বুকের রক্ত দিল তাদের দেশের জন্য, তবু সে দেশকে পড়তে হল শত্রু-কবলে! এরা কি এমনই পাপে মগ্ন যে, ভগবানকে এরা চায় নি—যার ফলে এই রোষ? না, এদের মাঝেই হাজার হাজার লোক ছিল, আজো আছে, ভগবানই যাদের সম্বল! ফ্রান্স, হায় ফ্রান্স, কি তোমার পতন! এই নিদারুণ অধঃপতনের পর, এই দৈন্যের শেষে, তুমি কি উঠে দাঁড়াবে না ভগবানের পানে, তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিয়ে? আমি প্রার্থনা করি, শান্তি আসুক, থেমে যাক এই রক্তক্ষরণ।

৩০শে জানুয়ারী। সোমবার। যখন আমরা পোশাক বদলাচ্ছিলাম, প্রাতরাশের ঘণ্টা বাজল। নিচে গিয়ে আমাদের ইতালীয় চাকরের মুখে শুনলাম, পারীর পতনের সংবাদ।...'টাইম্‌স্‌' পত্রিকায় পড়লাম, "কাল জার্মানরা দুর্গগুলি অধিকার করবে।" টেলিগ্রামে এই খবরই পাওয়া গেছে। এতক্ষণে বোধ হয় দুর্গ ওরা অবরোধ করে ফেলেছে। প্রত্যেক রেজিমেণ্টের অস্ত্র-শস্ত্র ওরা কেড়ে নেবে।...ফ্রান্স, হায় ফ্রান্স! আমার বুক থেকে আজ রক্ত ঝরে ঝরে পড়ছে।"

ভারতীয় এক তরুণীর লেখা এই ক'টি পাতায় আমি খুঁজে পেলাম সেই সুতীব্র ব্যথা, সেই বুক-ফাটা কান্না, সেই প্রায়শ্চিত্তের মনোভাব,

স্বদেশ-প্রেমের সেই স্বতঃস্ফূর্তি—যা এক দিন ঠিক ওই সময়েই আমায় বাধ্য করেছিল অখ্যাত এক ডায়েরীর পাতায় আত্মপ্রকাশ করতে। সত্যিই, এশিয়ার এই তরুণীর বুকে যে হৃৎপিণ্ড ছিল, তা আমাদেরই মত যে-কোনও ফরাসী রমণীর। সত্যিই আমাদের সেই দুর্গতির দিনে সেই হৃদয় থেকে আমাদেরই মত নীরবে রক্ত ঝরে পড়েছিল।

তরুর এই ডায়েরীতেই আমরা উল্লেখ পাই তার দিদি অরুর। মনোবৃত্তি ও রুচিতে দুই বোন ছিল অভিন্নাত্মা। দুই বোনই অবকাশ কি ভাবে পেতে হয়, জানত। তরুর প্রতিভার পথ থেকে অরু নিজেকে সর্বদাই বিচ্ছিন্ন রাখত, যাতে ছোট বোনের বিকাশের কোনও অসুবিধা না হয়। আমার চোখের সামনে দুই বোনের একটি ফটো মেলা আছে, যার মাঝে দুটি জীবনের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। অরু—সৌম্য, শান্ত, সংযত—বসে আছে; তারই পাশে, প্রেমে, নিবিড়তায় অরুকে যেন আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়ে আছে তরু—প্রাণোচ্ছল, অপূর্ব কেশদামমণ্ডিত, কাজল-চোখে আগুনের স্ফুরণ!

অরুরও বাসনা ছিল ফরাসী সাহিত্যের বেদীতে তার অঞ্জলি তর্পণ করবে। তার অনূদিত কবিতার মধ্যে 'The young captive'-ই অন্যতম! এই প্রশস্তি-কাব্য সে আশ্চর্য কৃতিত্বের সঙ্গে অনুবাদ করেছিল। তার রচনাশৈলী হয়ত কবি শেনিয়ে-র ফরাসী কবিতাকে ম্লান করে দিতে পারত। কবি Coigny-র মত সে-ও বুঝি বলেছিল,—

"এ-শুধু বসন্ত মোর; দেখে যাব নবান্ন-উৎসব;

* * *

উদ্যান-গরিমা-রূপে মোর কাণ্ড 'পরে
আজো শুধু হেরি নব অরুণাভা ঝরে,
অখণ্ড দিবস আমি দেখে যেতে চাই।

* * *

মরিতে চাহি না এই জীবন-প্রভাতে!"

১৮৭৬ সালে তরুর কবিতার বই প্রথম প্রকাশকালে সে লিখেছিল, "এইখানে জানিয়ে রাখি যে A-স্বাক্ষরিত কবিতাগুলি অনুবাদিকার একমাত্র প্রিয় জ্যেষ্ঠা ভগিনী অরুর অনুবাদ। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে, ১৮৭৪ সালের ২৩শে জুলাই, সে যীশুর চরণতলে চির-বিশ্রাম লাভ করেছে।...সে যদি আজ বেঁচে থাকত তবে তার সাহায্যে বইটিকে সমৃদ্ধতর করে তোলা যেত।...ভাষায় বা লেখনীতে প্রকাশযোগ্য যত কথা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে করুণ হচ্ছে, 'হতে পারত' কথাটি।"

এ-কথা তরু যখন লেখে, তার আগেই সেই ব্যাধির লক্ষণ তার মধ্যে দেখা যায়, যে-রোগের কবলে পড়ে তার দিদিকে ইহলোক ত্যাগ করতে হয়। ১৮৭৭ সালেই আমায় লেখা তার দ্বিতীয় পত্রে সে লিখেছিল, একটি বিশেষ ধরনের কাসি তাকে সর্বদা ভোগাচ্ছে। একদিন সে আমায় জানিয়েছিল, হয়ত পারী-তে সে আবার আসছে: তার বাবা ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে ওর চিকিৎসা করাতে চান। দুটি সন্তান ইতিপূর্বেই হারানোর পর ওর বাবা তাঁদের শেষ সন্তানটিকে বৃথাই যমের নজর থেকে আড়াল করবার চেষ্টা করছিলেন। তরুর শরীর কিন্তু এমন ভেঙে পড়ল যে ইউরোপ-যাত্রা স্থগিত রাখতে হল। ৩০শে জুলাই তরু আমায় কাঁপা হাতে লেখে; "মাদ্‌মোয়াজেল, দারুণ অসুখে ভুগলাম। বাবা-মার একান্ত প্রার্থনা ভগবান শুনেছেন, আমি ধীরে ধীরে সেরে উঠছি। শীঘ্রই আপনাকে বড় করে চিঠি লিখতে পারব আশা করি।"—সমস্ত বুকের রোগেই শেষ অবধি এমনি অলীক আশা রোগীকে ঘিরে রাখে।

আমায় সে আর চিঠি লিখতে পারে নি। তবে অনেকদিন আগে, এক বিষাদভরা মুহূর্তে সে আমায় যে ফরাসী লাইনটি পাঠিয়েছিল, হয়ত সেই লাইনটিই সে বারে বারে আবৃত্তি করেছিল শেষ সময়ে।

"অচেনা বঁধু, প্রিয়তমা, বিদায়, মোরে বিদায় দাও!"

তরুকে কোনদিন দেখি নি, তবু ওকে ভালবেসেছি। ওর প্রতিটি চিঠিতেই, ও অন্তরের সরল মাধুর্যের, ওর স্পর্শকাতর মনের, ওর সদা-

শয়তার পরিচয় আমি পেতাম, যার ফলে ক্রমেই ও আমার নিকটতম আত্মীয়ার মত হয়ে উঠেছিল, আর যার ফলে, ইউরোপীয় খ্রীষ্টান সভ্যতায় বড় হয়ে ওঠা সত্ত্বেও, ওর স্বভাবে ভারতীয় নারীর মজ্জাগত ধর্ম আমার চোখে ফুটে ওঠে। তা ছাড়া মাত্র বাইশ বছর বয়সে আমি যে-ভারতীয় নারীদের আদর্শে অনুপ্রেরিত হয়ে প্রথম বই লিখি, তাঁদেরই একজন বংশধরের হৃদয়ভরা ভালবাসা সাত সাগরের পারে থেকেও কি করে আমি উপেক্ষা করি?

তরু দত্ত সেরে উঠছে জেনে ওকে আমি অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। ওর মাধ্যমে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম ওর মা ও বাবাকে। 'নৎর-দাম ত্য ভিক্তোয়ার'-এর একটি প্রতিমূর্তি আমার ঘরে ছিল। তারই সামনে রাখা একটি তোড়া থেকে ছিঁড়ে নিয়ে ওকে আমি একটা ফুল পাঠাই। ফুলটি 'অ্যামারান্থ'। লালচে পাপড়িগুলো এর কখনও শুকিয়ে যায় না। অমরতার প্রতীক। হায় রে! তরু দত্তের নামে এ উপহার যখন পাঠাই, তার বেশ কয়েকদিন আগেই সে ইহলোকের মায়া কাটিয়ে চলে যায়! ওর বাবা-মার হাতে পড়বে আমার অভিনন্দন-পত্র, ওরই আরোগ্য-কামনায় লেখা!···

"গত ৩০শে আগস্ট সন্ধ্যাবেলা ও আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে সেই লোকের পানে—যেখানে বিরহ আর ব্যথার নাম কেউ শোনে নি।" ওর বাবা আমায় লিখে পাঠালেন, "ভগবানের প্রতি ওর বিশ্বাস ছিল অসীম; এক নিরবচ্ছিন্ন শান্তি নেমে এসেছিল ওর সত্তায়। একদিন ও ডাক্তারকে বলেছিল, 'দেখুন, শরীরের অসহ্য যন্ত্রণাই আমার চোখ দিয়ে জল টেনে আনে; তা নয়ত অন্তর আমার আজ অপরিসীম শান্তিতে মগ্ন। জানি ভগবানই আমার সহায়।'—এমন শান্ত স্বভাবের মেয়ে আমি দেখি নি, আমার এই শেষ সন্তানটির মত। আমার স্ত্রী ও আমি আজ, জীবনের সায়াহ্নে, নিঃসঙ্গ পড়ে আছি শূন্য এই গৃহে যার প্রতিটি কোণ একদিন মুখরিত ছিল আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় তিন সন্তানের কলস্বরে। না,

আমাদের ভগবান আছেন,—তিনিই সবার গতি, সব দুঃখে তিনিই সান্ত্বনা। সেদিন আগতপ্রায়, যেদিন আমরা সবাই আবার মিলিত হব পরমেশ্বরের চরণতলে চিরদিনের জন্য।"

আমায় এই চিঠি লেখার কিছুকাল আগেই তিনি তাঁর কন্যা তরুর জীবনী লেখা শেষ করেন এইভাবে, "কেন এই তিনটি তরুণ জীবন তাদের বিরাট আশাময় ভবিষ্যতের মায়া কাটিয়ে চলে গেল, আর আমি, পঙ্গুপ্রায়, পড়ে রইলাম এই শোচনীয় জীবন যাপন করতে? আমার মনে হয়, এ-সবই প্রস্তুতি—ওদের অনাগত জীবনের জন্য এ-সবের একান্ত প্রয়োজন ছিল। এমন দিন আসবে যখন সব হেঁয়ালিই পরিষ্কার হয়ে যাবে আমার চোখে। জয় পরমপিতার জয়! তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক!"

এই স্থির বিশ্বাসের মাঝেই আমরা বুঝি তরু দত্তের জীবনে তার পিতার প্রভাব কত গভীর, আর তাই তাঁর প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ চিত্ত স্বতঃই নত হয়।

তরু দত্তের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই 'Calcutta Review' পত্রিকায় তার প্রিয় কবি Gramont থেকে অনূদিত তাঁর আটটি সনেট প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ সনেটটি ঐশী করুণার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে রচিত। তরু দত্তের ব্যক্তিগত জীবনের শেষ কথা ক'টিই যেন এই সনেটে প্রকট হয়ে ওঠে। সর্বপ্রথম সনেটটির ভাবাবলম্বনে সনেটগুলির তলায় মন্তব্য করা হয়, ভগবানের ভালবাসা পৃথিবীর এই অস্ফুট পুষ্পটিকে যেন স্বর্গের দিব্য-পরিবেশে ফুটে উঠতে সাহায্য করে।

তরু দত্তের অকালমৃত্যুতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে-ক্ষতি হল, তারই প্রসঙ্গে রচিত শ্রদ্ধার্ঘ্য দেশ-বিদেশের যত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে পূর্বোক্ত পত্রিকাটি অন্যতম। 'Calcutta Review'-এ লেখা হয়, "তরু দত্ত ইংরেজী লিখতে পারতেন উচ্চশিক্ষিতা ইংরেজ রমণীর মতই সুরুচিসম্পন্ন সুদক্ষ ভঙ্গিতে। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই কোমল, অন্তর্মুখী, করুণ-রসাত্মক, গভীরধর্মভাবাপন্ন, নিষ্কলুষ ঊর্ধ্বায়িত কল্পনার

আলোয় সমুজ্জ্বল,—যা বর্তমান শতাব্দীর ইংরেজ কবিদের মাঝে তাঁর চিরস্থায়ী আসন পেতে রেখেছে !"

ভারত-অনুরাগী খ্যাতনামা ফরাসী পণ্ডিত, পারী-র এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ম'সিয়্য গারস্যাঁ দ্য তাসি একটি জনসভায় এইভাবে তরুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন, "গত ৩০শে আগস্ট, মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তরু দত্ত কলকাতায় দেহরক্ষা করেছেন। তিনি ছিলেন ক্ষণজন্মা প্রতিভার অধিকারী ; এই বয়সে তাঁর কেবল স্বদেশী ভাষা, পবিত্র সংস্কৃত ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল না, শুদ্ধ ভাবে তিনি ইংরেজী ও ফরাসী অনর্গল বলতে ও লিখতে পারতেন। এতে আমরা আশ্চর্য হই না, কারণ ইউরোপই ছিল তাঁর শিক্ষার ক্ষেত্র। সবচেযে বড় কথা, যে বয়সে তরুণ-তরুণীরা ছাত্রাবাসের গণ্ডি কাটিয়ে উঠতে পারে না, সেই বযসেই, আপন প্রতিভাদীপ্ত অম্লান লেখনীনিঃসৃত ইংরেজী কবিতার সংকলন তিনি প্রকাশ করেন। উত্তরকালে তিনি 'A Sheaf Gleaned in French Fields' নামে একটি বই প্রকাশ করেন, অপূর্ব ইংরেজী কবিতায় অনূদিত কযেকটি ফরাসী কবিতার সংকলন।...এই তরুণী নিজেকে যে খাঁটি ভারতীয বলে আমার কাছে ব্যক্ত করেছিল, এ হচ্ছে পরমশ্রদ্ধাস্পদ, পরমপণ্ডিত, কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট বাবু গোবিনচন্দ্র দত্তের সর্বশেষ সন্তান। গোবিনবাবু ইতিপূর্বেই আর এক গুণবতী কন্যাকে হারিয়েছেন ; এ-ও মাত্র কুড়ি বছর বয়সে যক্ষ্মাক্রান্ত হয়ে মারা যায়।"

ভারতের বড়লাট লর্ড লিটন-ই প্রথম এগিয়ে যান শোকসন্তপ্ত গোবিনবাবুকে সহানুভূতি জানাতে। ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যে ও রাজনীতিতে বংশানুক্রমে যাঁদের নাম বিখ্যাত হয়ে আছে, সেই পরিবারের সুযোগ্য সন্তান 'Clytemnestre' গ্রন্থের লেখক লর্ড লিটন—নিজেও একজন উঁচুদরের কবি—অতবড় ভারতীয় প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের সুযোগ্য ব্যক্তি। এই প্রসঙ্গে স্মরণ থাকতে পারে যে বিশ্ব-

বিশ্রুত 'Last days of Pompei' গ্রন্থের লেখক তাঁর পিতা—এবং খ্যাতনামা লেখিকা Lady Lytton Bulwer ছিলেন লর্ড লিটনের জননী। জননীর প্রভাব তাঁর চরিত্রের ওপর এমন গভীর রেখাপাত করে যে, কখনও নারীর মাঝে প্রতিভার সন্ধান পেলে সসম্মানে সে প্রতিভাকে স্বীকৃতি জানানো ছিল লর্ড লিটনের বৈশিষ্ট্য। ভারতের বড়লাট লর্ড লিটনকেই গোবিনবাবু তাই তাঁর কন্যার অপ্রকাশিত এই ফরাসী উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন।*

তরু দত্তের মৃত্যুর পর গোবিনবাবু তাঁর সন্তানদের সঙ্গে পরলোকে পুনর্মিলিত হবার আশায় বুক বেঁধে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তাঁর প্রিয় কন্যার রচনাবলী প্রকাশ ও প্রচার করতে। তরুর জীবনী-সম্বলিত 'A Sheaf Gleaned in French Fields'-এর নতুন সংস্করণ প্রকাশান্তে তিনি স্থির করেছেন, ফরাসীতে লেখা তরুর উপন্যাসটি ফ্রান্সেই প্রকাশ করবেন। আমি তাই 'শ্রীমতী আর্ভের-এর দিনপঞ্জী' ফ্রান্সে প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছি।

তরু দত্তের পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে আমি আবেগে অধীর হয়ে পড়ি। লেখাটি আগাগোড়া তার বুড়ো বাবা বসে বসে কপি করে পাঠিয়েছেন : "লিখতে গেলে হাত আমার কাঁপে ; ধীরে ধীরে তাই কপি করতে হয়েছে,"—গোবিনবাবু এই বিরাট কাজে হাত দেবার পর আমায় জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সুসম্বদ্ধ লেখার কোথাও বিন্দুমাত্র কেঁপে যাবার চিহ্ন পেলাম না। এই কঠোর অথচ দায়িত্বপূর্ণ কাজটি করবার সময় এক নতুন প্রেরণায় তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তা সহজেই বোঝা যায় ; আমায় তিনি লিখেছিলেন, "যতক্ষণ কপি করি, মনে হয়, আমি ওর সঙ্গেই কথা বলছি।"

* তরু দত্তের যে কয়টি রচনাবলীর উল্লেখ এ যাবৎ করেছি তা ছাড়াও তার অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির মাঝে পাওয়া গেছে কিছু মৌলিক ইংরেজী কবিতা এবং একটি ইংরেজী উপন্যাসের আটটি পরিচ্ছেদ।

পরিবেশে ও প্রেরণায় 'শ্রীমতী আর্ভের-এর দিনপঞ্জী' যতই ফরাসী হোক না, যতবার পড়ি, আমার মনে পড়ে যায় আমাদের দেশের টবে-সাজানো বিদেশী ফুলের কথা: এ-দেশের জল-হাওয়া তাদের যতই সয়ে যাক, তবু গন্ধ থেকে যায় সুদূর এক ভিন্-দেশের মাটির। ভারতের প্রভাব তেমনি এই উপন্যাসে থেকে গিয়েছে। মার্গরিৎ আর্ভের-এর প্রেমাস্পদ নরহত্যা করে নিজেকে সমাজের চোখে ঘৃণিত করে তুললেও, মার্গরিতের মনোভাব তার প্রতি অপরিবর্তিত রয়ে গেল,—এর মধ্যে শুধু বাইবেলের শিক্ষাই মূর্ত হয়ে ওঠে নি। হিন্দু সমাজের সেই রীতির কথাটাও স্মরণে আসে। পতি ভাল হোক মন্দ হোক, সৎ হোক, দুশ্চরিত্র হোক—তবু সে দেবতা। নায়িকার স্বভাব-মাধুর্য ও নম্রতা, প্রত্যেক চরিত্রের ঋজুতা, কবিত্বময় উপমা—সব কিছুই আমাদের বারে বারে ভারতীয় জীবনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তবু অনেক ভারতীয় লেখক দের মাঝে শ্লাঘনীয় অথচ সহজলভ্য যা নয়, তা এই বইয়ে আমরা পাই: সূক্ষ্মতা ও সংযম। ইংরেজী জীবনের প্রভাবও এর মাঝে কিছু পাওয়া যায়: পারিবারিক-বর্ণনা ও Home-এর নিবিড় আত্মীয়তা।

এই উপন্যাসে আমরা কাব্য থেকে নাটক, নাটক থেকে কাব্যে ঘুরে ফিরে আসি। অসাধারণ এর উদ্ভাবনা-শক্তি। ভারতীয় নারীদেরই মত স্বাভাবিক অথচ ফলপ্রসূ ভাষায় মার্গরিৎ আর্ভেরএর প্রতিটি ভাব-পরিবর্তন তরু সহজেই ফুটিয়ে তুলেছে—একাধারে তারুণ্যের নির্মল আনন্দ থেকে প্রেমের প্রচণ্ড আবেগ, অন্যদিকে সাধ্বী সতীর, নবীন জননীর সাংসারিক সুখ থেকে মৃত্যুর দারুণ বেদনা অবধি। মার্গরিতের দিনপঞ্জীর প্রথম কয়েকটা পাতায় আমরা পাই এক পঞ্চদশীকে কেন্দ্র-করে অনবচ্ছিন্ন পারিবারিক স্নেহচ্ছায়া; তারপর দুর্ঘটনার রুদ্র আবর্তে পূর্ণদীপ্তিতে জেগে-ওঠা নারীর আত্মচেতনা, অব্যক্ত ব্যথায় সে ফিরে দাঁড়ায় আশৈশব পরিচিত ক্রুশের পানে। ফ্রান্সের পল্লীবালার ধর্মভীরুতা সুন্দরভাবে এঁকেছে তরু দত্ত। মার্গরিৎ আর্ভের-এর চিত্তে ছেলেবেলার

ক্লমন্তেন্টের স্মৃতির কত মূল্য তা জানা যায় ভগিনী ভেরোনিকের মৃত্যুতে তার মনোভাব দেখে; আর তাঁর স্বর্গে অবস্থানের প্রতি তার দৃঢ় বিশ্বাসের মাঝে। পরিণযের মঙ্গল-সূত্রটিও তাই দেবমাতা মেরীর চরণ-তলে উৎসর্গ করে নিজেকে সে করে তোলে তাঁর একান্ত আশ্রয়ের উপযুক্ত। পত্নী ও মাতারূপে সে তাই ভোলে নি প্রেমাবতারেব জননীকে।

বহুবার মার্গরিৎ আর্ভের-এর কাহিনী পড়তে পডতে মনে হযেছে, এ-ও বুঝি ভারতীয় এক তরুণী আমাদের ফরাসী খ্রীষ্টান আওতায় বড হয়ে উঠেছে। তরু দত্তের চিঠি-পত্র পড়ে তার চরিত্র যে-রূপ নিয়ে আমার কাছে ধরা দিযেছে, সেই তরু দত্তের কণ্ঠই যেন থেকে থেকে শুনতে পেয়েছি মার্গরিতের কণ্ঠে। এই নায়িকার মধ্যেই বাব বার খুঁজে পেযেছি তরু দত্তের নিরাবরণ কমনীয় সত্তাকে, তার হৃদযের স্পর্শকাতর ভাল-বাসাকে, ভগবানের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাসকে। শ্রীমতী আর্ভের-এর পিতৃভবনই যেন তরু দত্তের বাসগৃহ। পিতা-মাতা পরিবেষ্টিত মার্গরিৎকে দেখে মনে পড়ে যায বাবা-মার স্নেহনীড়ে লালিত তরু দত্তের মুখ।

মৃত্যুর যে ভাবনা ধীরে ধীরে মার্গরিৎ আর্ভের-এর দিনপঞ্জীতে ঘনীভূত হয়ে উঠেছে তা লক্ষণীয। ষোড়শীর মনে প্রথমে জেগেছে বিস্ময়, মানুষ কি করে নিজের মরণ-কামনা করতে পারে? উদ্দাম যৌবনের সমস্ত প্রাণশক্তি দিযে সে প্রতিবাদ জানিয়েছিল এই মৃত্যুর বিরুদ্ধে, "হায় ভগিনী ভেরোনিক! কতই বা তাঁর বযস! এই ত সবে ছাব্বিশ বছর পূর্ণ হযেছে।—মৃত্যু? এত কাছে? পরম পিতার স্নেহে, আনন্দে মুখর এই গৃহ ছেড়ে যাওয়া? ভগিনী ভেরোনিক পরম সুখে মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন! কেন,—আমি বুঝে উঠতে পারি না। জীবন কি শুধুই তিক্ততার একটানা অভিজ্ঞতা? মাধুর্য কি সেখানে নেই?…এ-অবধি কোনদিন ব্যথা কি আমি জানতে পারি নি। এই জগৎ…কী সুন্দর!"

কিন্তু ওর ভুল ভাঙতে দেরি হয় না। জীবন তার স্বরূপ নিয়ে মার্গরিতের কাছে আত্মপ্রকাশ করে! মানসিক উদ্বেগের পরেই শারীরিক যন্ত্রণা! তরু দত্ত যথার্থ বাস্তবিক জীবনের রস দিয়েই তা ব্যক্ত করেছে। লেখিকার নিজের জীবনের ছায়া ও অসুখের অন্তিম অভিজ্ঞতা পুরোমাত্রায় উপন্যাসের শেষ অংশটিকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে মৃত্যু-চিন্তায়। তবু, মৃত্যুর সঙ্গে চিরন্তনের ধ্যান ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত। ভগিনী ভেরোনিকের অন্তিম শয্যায় যে অমরতার আলো দেখা দিয়েছিল, সেই আলোতেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মার্গরিতের শেষ মুহূর্ত, সেই আলোই ভাস্বর হযে ওঠে তরু দত্তকে ঘিরে!

মার্গরিতের মধ্যে আমরা যদি তরু দত্তের ভাবধারা চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও অকাল-মৃত্যুর সাদৃশ্য পেয়ে থাকি, সে সাদৃশ্য এইটুকুতেই সীমাবদ্ধ। তরু দত্তের জীবনে আসে নি সেই ঝড়, যে ঝড় অকালেই মার্গরিতের জীবন-কলিটি বৃন্তচ্যুত করল। অল্প বয়সেই তরু দত্ত ইহলোক ত্যাগ করে। দাম্পত্যের ও মাতৃত্বের প্রেমরসে তরু ছিল বঞ্চিত। কেবল হৃদয়ের প্রশস্ততা দিয়েই কল্পনার সাহায্যে এ-রস সে উপলব্ধি করেছিল। তার মা আর বাবা রয়ে গেলেন এই পৃথিবীতে—তার সঙ্গে পরলোকে মিলিত হবার ঈপ্সিত-লগ্নের অধীর প্রতীক্ষায়! যদিও তার মা-বাবার অন্তরেই তার জীবনের স্মৃতি আঁকা আছে সবচেয়ে গভীরভাবে, তার সাহিত্যের খ্যাতি আজ পৌঁছে গেছে বিশ্বসাহিত্যের এজাহারে। ভারতবর্ষ ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে এই যশস্বিনীর গৌরব নিয়ে ইতিমধ্যেই কাড়াকাড়ি লেগে গেছে। আমি বলতে পারি ফ্রান্সও চিরদিন স্মরণ করবে এই তরুণী বিদেশিনীকে, ফ্রান্সের দীনতম মুহূর্তে যে তার ভাষার ও হৃদয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজেকে ফরাসীদের সঙ্গে অভিন্নাত্মা মনে করেছিল।

আগষ্ট, ১৮৭৮ ক্লারিস বাদের
পারী

শ্রীমতী আর্ভের

২০শে আগস্ট ১৮৬০।—আজ আমার জন্মদিন। এখন আমি পঞ্চদশী। পাঁচ বছর বাদেই আমার বয়স হবে কুড়ি। সময় উড়ে চলেছে। আমার মা-মণি আজ বড় ব্যস্ত,—আমার খাতিরে বাড়িতে বিরাট ভোজ হবে। অতি সুখে কয়েকটা বছর যে কনভেণ্টে কাটিয়েছি, তা অল্প দিন হল ছেড়ে এসেছি। এখানে পৌঁছেছি গত পরশু। কনভেণ্টে সিস্টাররা সবাই আমাকে কিছু কিছু উপহার দিয়েছেন। তাঁদের ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে যাচ্ছি বাবার সঙ্গে, তাই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা সবাই, বিশেষতঃ ভগিনী ভেরোনিক ; আমার পাশে বহুক্ষণ তিনি বেদীর সামনে প্রার্থনা করলেন, তারপর আমায় আলিঙ্গন জানিয়ে ছোট একটি রুপোর ক্রুশ দিলেন আমার হাতে।

"এটা তোর সুখেরই পরিচায়ক, বুঝলি ?" আমার গলায় একটি কালো ফিতে দিয়ে সেটি বাঁধতে বাঁধতে তিনি বললেন, "অনেক সঙ্কট-মুহূর্তে এর কাছে আমি পেয়েছি সান্ত্বনা ; তোর প্রয়োজনের সময় তোকেও এ সান্ত্বনা দেবে ; সর্বদা তাঁর কথা স্মরণে রাখিস, যিনি আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে ; আমি জানি কত কোমল তোর অন্তর, আমাদের ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিতে কত তোর আস্থা। সব বিপদের মাঝে তিনিই তোকে রক্ষা করবেন, তিনিই তোকে ধন্য করবেন তাঁর আশীষে।"

ভগিনী ভেরোনিককে ছেড়ে আসার সময় আমি খুব কেঁদেছিলাম। কারণ, যত দিন আমি কনভেণ্টে ছিলাম, সব সময় তাঁকে আমার বড় বোনেরই মত মনে হয়েছে।—বসবার ঘরে বাবা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর সঙ্গে এই শান্তির প্রবাস ত্যাগ করে এলাম। বাবাকে দেখে যে কী আনন্দ হল! বাড়ি যাবার পথে কত বার যে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। আমায় দেখার আনন্দে তাঁর মুখেও হাসির বিরাম ছিল না।

"আরে খুকী", তিনি বললেন, "তুই কত বড় হয়েছিস্, কি সুন্দর

হয়েছিস্ ; তোর মা তোকে দেখে চিনতেই পারবেন না !"

"আমায় তাহলে ভালই দেখছ ?"

"খাসা দেখছি রে খুকী।"

"যাঃ, তুমি শুধুই বানিয়ে বলছ। শ্রীমতী ল্যমোইন বলেন যে আমার গাল দুটো যেন একটু বেশি লাল, আর আমার গায়ের রং একটু চাপা, কিন্তু জান বাবা, তাঁর রঙ, তিনি গৌর যেন—"

"গৌর যেন পাকা গমের···" বাবা হাসতে হাসতে গেয়ে উঠলেন।

"এ ত ম্যুসের উপমা !"

"সে কি রে, তোদের কনভেণ্টে ম্যুসে পড়ানো হয় ?

"হয় না, তবে সেই ইংরেজ মহিলা, শ্রীমতী বার্থা ফ্রিথ, তাঁর কাছে ত ফরাসী কাব্যের এক সংকলন আছে ; তিনিই আমায় দিয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ, তা কি বলছিলি সেই গৌরবর্ণা সুন্দরীর কথা ?

"ওহো শ্রীমতী ল্যমোইন।" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "সত্যি বাবা, কি সুন্দর তিনি, আর কি ফর্সা, কি তাঁর সোনালী চুলের বাহার ! তবু, তবু তাঁর চেয়ে আমার ভগিনী ভেরোনিককেই বেশি ভাল লাগে : তাঁর কথাই তোমায় বলব। বয়সে তিনি শ্রীমতী ল্যমোইনের চেয়ে ছোটই, কিন্তু তাঁকেই যেন বড় বলে মনে হয়। খুব ভাল লোক। জান বাবা, যখন শ্রীমতী ল্যমোইন আমার অনভিজ্ঞতা ও বেখাপ আচরণ দেখে হাসি-ঠাট্টা করতেন (অবশ্য তাঁর কোনই দোষ ছিল না, কারণ প্রথম প্রথম সত্যি আমি বড় বেমানান ব্যবহার করতাম), তখন ভগিনী ভেরোনিকই ছিলেন আমার সহায় আর তিনিই আমায় শিখিয়ে দিতেন কি ভাবে কি করা দরকার। জান, প্রথম মাসটা তোমার আর মা-মণির কথা ভেবে এত ব্যাকুল হয়ে পড়তাম যে আমার ছোট্ট ঘরটিতে বসে শুধু কাঁদতাম আর ভগবানকে ডাকতাম ; তাই দেখে ভগিনী ভেরোনিক আমার প্রতি খুব সদয় হয়ে উঠলেন। তাঁর বাবা ও মা দু জনেই মারা গেছেন ; আমাকে তাঁদের কথা তিনি বলতেন, আর

বলতেন তাঁর ভাইয়ের কথা, যে খুব ছোট বেলাতেই মারা যায়; আর তাঁর এক খুড়তুত ভাইয়ের কথা, যিনি একটা জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন এবং সে বার যখন তাঁর জাহাজ ডুবে যায় তখন আর সবার সঙ্গে তিনিও মারা যান; সেই থেকে ভগিনী ভেরোনিক সন্ন্যাস নেন।"

এই ভাবে আমাদের কথাবার্তা চলছিল। পরদিন সকালে বাড়ি পৌঁছলাম। দেখি, দরজায় মা-মণি আমাদের পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ছুটে গিয়ে তাঁকে আমি জড়িয়ে ধরলাম।

"মা, মা গো!"

"আয় বাছা!"

এত দিনের বিচ্ছেদের পর আমায় দেখে বাবা খুব সুখী, খুব উৎফুল্ল হয়ে পড়েছেন। মায়ের সঙ্গে আজ আমি রান্নাঘরে বসে আছি দেখে তিনি আমায় বললেন, ও-সব ছেড়ে একটু বিশ্রাম করে নিতে।

আরও বললেন, "আজ যে তোর জন্মদিন!"

মা আর আমি রান্নাঘরে কিছু বিশেষ রকম রাঁধবার আয়োজন করছিলাম। কাছাকাছি ভাল রাঁধুনের হদিশ মেলা ভার। আজ সন্ধ্যায় অনেকেই আসবেন আমাদের এখানে। প্ল্যুরারভেন-এর জমিদার-গিন্নী তাঁর দুই ছেলে নিয়ে আসবেন। বড় ছেলে, যে বর্তমান জমিদার, তার বয়স খুবই অল্প, আর তেরেস কাল সন্ধ্যায় বলছিল যে ছেলেটি "রাজপুত্রের মত দেখতে"। সে আমার ছেলেবেলার বন্ধু ছিল, কিন্তু কনভেন্টে যাবার পর আর তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নি, তা প্রায় চার বছর হল; আর ছোটদের ত কোন কিছু ভুলতে সময় লাগে না।

আমার মা সাজ-গোজ করতে গেলেন। কারণ ছটা বাজে প্রায়, আর আমাদের খাওয়া সাতটায়। ফিরে এসে তিনি দেখলেন, এলো চুলে আমি টেবিলের সামনে বসে আছি।

"সে কি খুকি, কি করছিস এখনও?" আমার চুলে হাত বুলিয়ে তিনি তাড়া লাগালেন। "আর সময় নষ্ট করিস না। সত্যি বলতে কি,

মার্গরিৎ, তোর এই চুলের রাশি বাঁধতেই ত দু ঘণ্টা লাগবে।"

এই বলে তিনি আমার কালো চুলের গোছা দুই হাতে তুলে ধরলেন, কন্যার কেশ-প্রাচুর্যে গর্বিত হয়ে। তারপর আমার কপাল চুম্বন করলেন।

"খুব সুন্দর করে সেজে নে ত; তুই নীল রিবন পরলে তোর বাবার খুব ভাল লাগে।"

—"আর যখন সাদা মসলিন পরি—তাই না?"

—"হ্যাঁ মা!"

তারপর আমায় আলিঙ্গন জানিয়ে তিনি চলে গেলেন। ওই যাঃ! ঘড়িটা বেজে উঠল: সাড়ে ছটা। আজ এখানে শেষ করি।

ওঃ, কাল সন্ধ্যাটা কি ভালই কাটল। আমায় সবাই জানালেন অভিনন্দন, আর আমার স্বাস্থ্য-কামনা করে প্রত্যেকেই শ্যাম্পেন পান করলেন। নাঃ, প্রথম থেকেই সুরু করা যাক। বসবার ঘরে ঢুকে দেখি ইতিমধ্যেই মাদাম গোসরেল আর তাঁর কন্যা উপস্থিত। আমার মাব সঙ্গে তাঁরা গল্প করছিলেন। বাবা আমায কানে কানে বললেন, যে-ফুলের নামে আমি পরিচিত তারই মত নাকি সুন্দর লাগছে আমায। শ্রীমতী গোসরেল সাদরে আমার হাত ধরলে।

"এই তো, খুকী এসেছে," সে বলল, "কত বড় হয়ে গেছে, না মা?"

শ্রীমতী য়্যোফোনী গোসরেল সারা দেশে সুন্দরী বলে খ্যাত। আমার চেয়ে বয়সে বড়; বোধ হয় ছাব্বিশ হয়েছে; দীর্ঘ তনু, ঈষৎ লালচে সোনালী চুলগুলি মাথার চার পাশে আলোক-মণ্ডলের মত শোভা পায়; হালকা নীল অথচ অতি প্রখর চোখ দুটি; উন্নত টিকোল নাক; ঠোঁট দুটি যেন একটু বেশী পাতলা, আর দাঁতগুলি সুবিন্যস্ত, সুচারু। মুখে হাসি লেগেই আছে; বাবা বলেন, দন্তরুচি দেখানোই তার উদ্দেশ্য; আমার বাপু তা মনে হয় না; হাসি না পেলে কি হাসা সম্ভব? তা

বাবা ত আমার সঙ্গে এমন মস্করা হামেশাই করেন। শ্রীমতী গোসরেলের সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় দরজা খুলে গেল আর শুনলাম প্লুয়ারভেনের জমিদার-গিন্নী ও তার ছোট ছেলে গাস্ত এসেছেন। আমার মা তাঁদের কাছে গেলেন ও জমিদার-গিন্নীকে সোফায় বসিয়ে দিলেন।

"কই মার্গরিৎ কই?" সহাস্য প্রশ্ন বেরিয়ে এল।

ইঙ্গিতে মা আমায় তাঁদের কাছে ডাকলেন; উঠে গেলাম। জমিদার-গিন্নী আমার দুই হাত চেপে ধরে পাশে নিয়ে বসালেন, বহুক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার দিকে।

"কি সুন্দর, কি অমায়িক!" বলে ওষ্ঠ দিয়ে আমার ললাট স্পর্শ করলেন তিনি। হালকা স্বরে তার পর বলে চললেন, "বুঝলি বাছা, প্রাসাদে তুই এত ঘন ঘন আসতিস আমার দ্যুনোয়া ও গাস্তঁর সঙ্গে যে তুই-তোকারি করেই তোর সঙ্গে কথা বলতে আমি অভ্যস্ত ছিলাম। নিজের সন্তান মনে করেই তোকে আজ দেখতে এলাম। দ্যুনোয়াকে দেখলে তুই বোধ হয় চিনতেই পারবি না?"

"না, বোধ হয় না, তখন আমি ত নেহাৎ ছোট ছিলাম।"

"এখন আমার তুই কি হয়েছিস খুকী?" মধুর হাসি ছড়িয়ে তিনি বললেন, "এই ত সবে পনের বছর হল; আমার দ্যুনোয়ার হল তেইশ বছর।"

আবার সেই দরজা খুলে গেল, "ওই দেখ কে এল; কি সুন্দর ওকে দেখতে, না?" মাতৃসুলভ গর্বের সঙ্গে তিনি জানতে চাইলেন।

"হ্যাঁ।"

কথাটা আমার মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে এল, কারণ তার পেছনে অতি বড় সত্য ছিল। অপরূপ সে সৌন্দর্য! সুদীর্ঘ চেহারা, অনেকে হয়ত একহারাই বলবেন, মাথার চুলগুলি কালো, কোঁকড়ানো, কাঁধ অবধি এসে পড়েছে; সুন্দর আয়ত গভীর দুটি চোখ; ললাটে আভিজাত্য; সুগঠিত ওষ্ঠের ওপর স্বল্প গোঁফের রেখা; গায়ের রঙটা অনেকটা

মেয়েলী ধরনের সাদা, যা দেখে বোঝা যায় কোনও সম্ভ্রান্ত বংশেই তার জন্ম। ইশারায় তার মা তাকে কাছে ডাকলেন।

"এই দেখ হ্যানোয়া, এই যে মার্গরিৎ। কত বড় হয়ে গেছে না ?"

আমায় সে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাল। জমিদার-গিন্নী তাকে নিজের পাশেই বসালেন।

"নাও বাছারা, করমর্দন কর," মৃদু হেসে তিনি বললেন, "এমন দিন ছিল যখন তোমরা বিনা দ্বিধায় পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে।"

আমি লাল হয়ে উঠলাম। তিনি আমার হাতটা নিয়ে জমিদারের হাতে দিতে সে হেসে বললে, "মা-মণি, তুমি যে সন্তদেরই মত বাৎসল্য ও মাধুর্যে গড়া, তাই খেয়াল কর নি যে শ্রীমতী গোসরেল আমাদের লক্ষ্য করছেন।"

"দেখছে দেখুক!" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি ত কিছু অন্যায় করছি না।"—আমি হাতটা সরিয়ে নিতে তিনি একটু যেন চেঁচিয়েই উঠলেন, তার পর আমার শির-চুম্বন করলেন; আমার মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি ছেলের দিকে ফিরে বললেন, "ভারি চমৎকার দেখতে মা আমার, তাই না ?"

"হ্যাঁ মা," সে পাল্টা জবাব দিল, "কিন্তু তোমার চেয়েও কি বেশি ?"

আজ সকালে বাবা আর আমি বনে গিয়েছিলাম; সেখানে জমিদার ও তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। তুঁত আর জংলী বেরি খেতে খেতে মুখ আমার ফলের রসে রঙীন হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে দেখি ওরা আসছে। আমি পালিয়ে যেতে চাইছিলাম, কারণ এমন আলুথালু চুল ও বেগুনে মুখে ত কারো সামনে যাওয়া চলে না। কিন্তু বাবা আমার হাত ধরে ফেললেন। দুষ্টুমিতে তাঁর চোখ ভরে উঠল।

"এই দেখ হ্যানোয়া, জংলী এই গেঁয়ো মেয়েটাকে দেখ," হাসিতে

তিনি ফেটে পড়লেন।

"না, জেনেরাল, বরং বলুন বনপরী।" ঘনিষ্ঠ তার স্বর!

আমার মুখ রাঙা হযে উঠল। তবে কি ও বলতে চায় যে এই অবিন্যস্ত বেশেই আমায় বেশি সুন্দর লাগে?—দুপুর অবধি আমরা গল্প করে বাড়ি ফিরলাম। জমিদার জানতে চাইল কবে আমি তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাব।

"দিন পনেরর আগে নয়," বাবাই আমার হযে উত্তর দিলেন। "বুঝলে দ্যুনোয়া," আমার কাঁধে হাত রেখে তিনি বলে চললেন, "এত দিন ও আমাদের কাছ-ছাড়া হযে থাকায় এখন এক দণ্ডও ওকে আমি চোখের আড়াল করতে পারছি না। তবে যদি তোমার মা বলেন ত দু তিন সপ্তাহেব মধ্যেই ও তোমাদেব ওখানে যাবে।""

এই প্রতিশ্রুতি পেযে ও ভারি খুশী হল। যাবাব সময় তাই বলে গেল যে, তার মা সর্বদাই আমাব পথ চেযে বসে থাকবেন সাগ্রহে।

আজ সকালে আমি গ্রামের পুরনো বাসিন্দাদের দেখতে বেরিয়েছিলাম। একটি পরিবারকে আমার বড় ভাল লাগে। বুড়ো বাপ আঁদ্রে কোরেন, তাঁর স্ত্রী মিশ্তাল আর ষোল বছরের এক মেয়ে; মেয়েটি খুবই কর্মতৎপর, ধীর ও সুশ্রী। বেচারাদের দিন কাটে দারুণ দারিদ্র্যে। মেয়েটি আপ্রাণ চেষ্টা করে রোজ দু মুঠো অন্নসংস্থানের জন্য, কিন্তু একজনের রোজগারে তিনটে পেট চলে না। তা সত্ত্বেও এদের কোন অভিযোগ নেই, কারও কাছে নিজেদের দুঃখের কথা ভাঙে না। এত চাপা ওদের স্বভাব, তবু আমি জানি কী দারুণ ওদেব অভাব! সহৃদয়া জমিদার-গিন্নীকে এদের কথা বলব ভাবছি কারণ তাঁর নাকি একটি পরিচারিকার দরকার।

আজ সকালে আমার জানালার সামনে বসেছিলাম। দিনটা বেশ উজ্জ্বল; নির্মেঘ পরিষ্কার আকাশ। বসে বসে ভাবছিলাম, আমাদের

প্রতি—এই সব পাপীতাপীদের প্রতি—ভগবানের করুণার কথা। বাগানে ঝরণার দিকে তাকিয়ে দেখলাম—একটা চড়ুই সেই জলে তৃষ্ণা মেটাচ্ছে। প্রত্যেক বার জল পান করে সে আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইছে, যেন কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে তার সৃষ্টিকর্তাকে, সর্বমঙ্গলময়কে। হে ভগবান! আমার হৃদয়েও যেন অনুভব করতে পারি তোমার মহত্ত্ব, তোমার কৃপা। আজ আমি গ্রেস্তিনদের মাকে দেখে এলাম; গ্রামের মধ্যে তিনিই সব চেয়ে বৃদ্ধা। তারপর গেলাম কোরেনদের বাড়িতে। জানেৎ দেখলাম মামুলী গোছের একটা সুপ জ্বাল দিচ্ছে; এক খণ্ড মাংস আর একটা ফুলকপি তার মধ্যে ছেড়ে দিলাম,—এগুলি আমার বাক্সেই ছিল। ছাইয়ের তলায় গোটা বারো আলুও ঝলসে দিলাম। গরীব বেচারাদের জন্য এই দিয়েই বেশ ভাল একটা খানা তৈরী হল। ওদের বাবা-মা হাঁ হাঁ করে ছুটে এসেছিলেন আমার কাণ্ড দেখে; কিন্তু আমি বললাম যে এ-বিষয়ে তাদের মাথা না ঘামালেও চলবে। আমার সঙ্গে সঙ্গে জানেৎ এল ছোট ওই বেডাটা অবধি। আমায় ধন্যবাদ জানাতে চায়, কিন্তু একটি চুমুতেই তার মুখ বন্ধ করে দিলাম। তার চোখ দুটি জলে ভরে উঠল; আমারও সেই অবস্থা, বহু চেষ্টায়ও নিজেকে চাপতে পারলাম না।

ছোট্ট একটি গেঁয়ো সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বাড়ি ঢুকছি, এমন সময় বাবার গলা শুনলাম।

"এতক্ষণে ফিরলি খুকী!" হলঘর থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন, "আমি ত ভেবে সারা, কোথাও কিছু ঘটল বুঝি!"

"তুমি কি আমায় খুঁজছিলে, তোমায় উদ্বিগ্ন করার জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি বাবা!"

"আরে, আগে ভেতরে আয়, এই দেখ লুই এসে বসে আছে এক ঘণ্টা ধরে; বাড়িতে আর কেউই নেই ওর সঙ্গে কথা বলে।"

তারপর এক তরুণ অফিসারের সঙ্গে বাবা আমার পরিচয় করিয়ে

দিলেন; আগে কখনও দেখি নি একে।

"এই যে লুই, এই আমার মেয়ে, আমার একমাত্র সন্তান।"

অফিসারটি এমন সরল হাসি ও অমায়িক দৃষ্টিতে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন যে তক্ষুনি আমি বড়ই আশ্বস্ত বোধ করলাম।

"কি রে মার্গরিৎ, এর কথা বোধ হয় তোর মনে নেই, না?"

"উঁহু—" আমি মাথা নেড়ে জানালাম।

"তোমরা যে দু জনেই খুব ছোট তখন।"

লুইয়ের বয়স বড জোর বছর কুড়ি। রোদে-পোড়া মুখে নতুন রোমের উন্মেষ; মনোহর গঠন, সুবিশাল বুক, ঘন কটা চুল; নির্ভীক স্বচ্ছ কপিল দুটি চোখ স্নেহ ও অকপটতায় ভরা। ঠোঁটে তার থেকে থেকে একটা ব্যথার ছাপ ফুটে ওঠে, বিশেষতঃ যখন তার মায়ের কথা ওঠে; কিন্তু হাসলে তার সারা মুখ দীপ্ত হয়ে ওঠে। আমার কাঁধের ওপব বাবা হাত বাখলেন।

"সাবধান।" গভীব অথচ সকৌতুক কণ্ঠে তিনি বললেন, "তোমাব সামনে যাঁকে দেখছ, তিনি হচ্ছেন দ্বাবিংশ অশ্বারোহী বাহিনীর বিখ্যাত কাপ্তেন লুই লফেভার; সম্প্রতি ইনি আলজেরিয়া থেকে ফিরছেন। কয়েক দিন এখানেই কাটাবেন। গিয়ে এর জন্যে একটা ঘর সাজিয়ে ফেল্। তার আগে তোব মাকে এক দৌড়ে গিয়ে বলে আয় যে লুই এসেছে। তাঁকে ত কোথাও দেখতেই পেলাম না; নইলে নিজে গিয়েই সুখবরটা তাঁকে দিয়ে আসতাম।"

গিয়ে দেখি ক্ষেতের মধ্যে মা তাঁর মটর আর শিমগাছগুলোর পরিচর্যা করছেন।"

"মা, লুই লফেভার এসেছেন।"

চট করে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন।

"কি বললি খুকী?" তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "এমন খবর এনে দিলি, আয় রে, তোকে চুমা দিই।"

আমায় চুম্বনান্তে তিনি আমার হাত ধরে বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

"বলি ওগো!" বাবাকে তিনি শুধালেন, "আরও আগে আমায় খবর দিতে পার নি?"

"তোমায় যে কোথাও খুঁজে পেলাম না গো," লুইকে একটা নতুন বন্দুক দেখাতে দেখাতে তিনি চোখ তুলে জবাব দিলেন।

"লুই, বাপ আমার, তোকে দেখে কী যে সুখী হলাম।"

এগিয়ে গিয়ে তিনি কাপ্তেনের শির চুম্বন করলেন। সে বেচারা বড় বিচলিত হয়ে পড়ল; ঠোঁট দুটি তার কাঁপতে লাগল, আর ঝাপসা হয়ে এল তার চোখ। বাবা আমায় তার কাছে টেনে নিয়ে গেলেন। তাঁর চোখও সজল; কিছুই আমি বুঝতে পারলাম না। এখন অবশ্য সবই জানি। মাত্র সতের বছর বয়েসে লুই অনাথ হয়; তার বাবা মারা যাবার দুদিন বাদেই মারা যান তার মা। আমার বাবা ও তার বাবা ছিলেন একই সৈন্য বিভাগে। শোকে মুহ্যমান তরুণ উন্মাদপ্রায় অবস্থায় তখনই আফ্রিকা চলে যায়। বাবা-মা ছাড়া বেচারা কিছুই জানত না! সেই শেষ বারের মত আমার মা বাবার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। নাঃ, এবার আমার কাহিনী থামানো দরকার।

"এত দিন কেমন ছিলি রে লুই? ভাল ত?" মা জানতে চাইলেন।

"না, বরাবরই ভাল ছিলাম না; এখান থেকে যাবার তিন দিন বাদেই জ্বরে পড়ি, যার জের এক মাসেরও বেশি চলে; কিন্তু বর্তমানে", সে হাসল, "আমার চেয়ে ভাল স্বাস্থ্য কারও আছে কিনা জানি না।"

খাবার পর বাবা আমার হাতে লুইকে ন্যস্ত করে দেবার সময় বলে গেলেন, "মার্গরিৎ, লুইকে এবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তোর আশ্রিতগুলো দেখিয়ে আন; আমায় কিছু চিঠি লিখতে হবে আর তোর মা ঘর গোছাতে বসবেন।"

অতিথিকে আমি বাগানে নিয়ে গিয়ে আমার খরগোশ দেখালাম। আদর করবার জন্য লুই তাদের একটাকে সবে হাতে তুলেছে আর অমনি দুষ্টুটা কচ করে ওর আঙুলে কামড় বসিয়ে দিল। দেখলাম অতি ধীরে সে জন্তুটাকে ঘাসের ওপর নামিয়ে রাখল, যেন কিছুই হয় নি। কিন্তু লক্ষ্য করলাম খানিক বাদে, ওর আঙুল দিয়ে রক্তের ধারা বয়ে চলেছে।

আমি ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইলাম, "জন্তুটা কি তোমায় কামড়েছে?"

সে শুধু হাসল, "নাঃ, ও কিছু নয়।"

কিন্তু আমায় নাছোড়বান্দা দেখে শেষ পর্যন্ত ও দেখাল, একটা আঙুলে ছোট্ট চারটি দাঁতের দাগ। তাড়াতাড়ি আঙুলটা আমি বেঁধে দিয়ে অপ্রতিভ হয়ে প্রশ্ন করললাম, "তোমার কি খুব বেশি ব্যথা করছে?"

"মোটেই না।" তারপর নিচু গলায় লুই বলল, "জান, তোমায় দেখে আমার মায়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।" আমি চুপ করে রইলাম।

তেমনি ভাবেই লুই জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা তুমি কি তাঁকে দেখেছ?"

"বোধ হয় আমি দেখেছি, তবে তাঁর চেহারাটা ঠিক মনে পড়ে না।"

একটা বুড়ো ওক গাছের তলায় গিয়ে আমরা বসলাম।

"বল ত, আফ্রিকায় গিয়ে তুমি কি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে?"

"আমার বাঁচবার আশাই ছিল না", প্রিয়জন বলতে বিছানার পাশে কেউ ছিল না, যার থেকে একটু সান্ত্বনা পাই; আমার মা-বাবা মারা যাবার ঠিক এক মাস পরের কথা; এক সহকর্মী আমার শুশ্রূষা করত; প্রলাপের ঘোরে কত বার যে মাকে দেখেছি। তাঁকে দেখতাম, মার্বেলের মত সাদা, সারা মুখ এক অপূর্ব মধুর হাসিতে উজ্জ্বল; তিনি আমার হাত দুটো এসে ধরতেন; আমার জ্বলন্ত কপালের ওপর রাখতেন তাঁর ওষ্ঠ,—আমি তখনই শারীরিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে

উঠে বসতাম, কিন্তু আবার ভেঙে পড়তাম নিরাশায়। কারণ, এই ভাবেই ত তাঁর সঙ্গে পরলোকে মিলিত হবার ক্ষণটি পেছিয়ে যেত।"

সে থেমে গেল আর স্বপ্নালু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল দূরের মাঠ পানে।

আমি কাঁদছিলাম। হঠাৎ সে মুখ ফেরাল।

"একি, তুমি কাঁদছ? আমার জন্যে?"

"কত কষ্টই না পেয়েছ তুমি!" আমি উত্তর দিলাম। খানিক বাদে স্বাভাবিক ভাবে সে আমায় বলল, "চল ত, তোমার বাবার বুড়ো ঘোড়াটা আমায় দেখিয়ে দেবে।"

আজ খুব ভোরে উঠে প্রাতরাশের আগেই আমি হাঁস-মুরগীগুলোকে খেতে দিচ্ছিলাম। লুই এসে দাঁড়াল আমার পাশে।

"তুমি দেখছি খুব সকাল সকাল উঠেছ আজ; দেখ আমিও কেমন উঠে পড়েছি!" সে বলল।

"তা ত হল, কিন্তু তোমার আঙুলের খবর কি?"

"বোধ হয় ভালই আছে, যদিও আজ আর খুলে দেখি নি।"

"ব্যাণ্ডেজটা এ অবধি খোলই নি?" সবিস্ময়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

"উঁহু, যেহেতু তুমি বেঁধেছ তোমাকেই এটা খুলে দিতে হবে।" তার অনুরোধ মত আমি খুলেই দিলাম। বুড়ি দাই তেরেস তখন সেখান দিয়ে আসছিল।

"কাপ্তেন সাহেবের হল কি খুকুমা?"

"বুঝলে তেরেস, একটা খরগোশ এত দুষ্টু যে ওকে কামড়ে দিয়েছে।"

"ওঃ, এই কথা? বাছা রে! আমার ত মনে হয় ওর আসল ক্ষত আরও গভীর।"

এই বলে সে চলে গেল। লুই আমার দিকে একটু ঝুঁকে বসল। তার চাউনির ভঙ্গিতে আমি বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। "ও বুঝলে,

ও হচ্ছে আমার মায়ের দাই," আমি কথা ফেরালাম, "আচ্ছা, একটা কথা। তুমি কি কখনও খুব আহত হয়েছিলে ?"

"তিনবার," সে একটু থেমে বলল।

"গুরুতরভাবে ?"

"আমি শুধু গুরুতর আঘাতের কথাই মনে রাখি।"

প্রাতরাশের পব আমরা সবাই বনে গেলাম। আমাদের আগেই বাবা-মা বাড়ি চলে গেলেন। ছোট্ট নদীটিব তীরে লুই আব আমি যখন বসেছিলাম, পথের দিকে চেয়ে লুই বলল : "কেউ যেন আসছে।"

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে উত্তর দিলাম, "জমিদার আসছে।

লুই ভ্রূকুটি করল, "কে জমিদার ? নাম কি ?"

"প্রুয়াবভবনেব জমিদার।"

"তুমি ওকে চেন ?"

"হ্যাঁ, ওব মা আর আমাব মা একই কনভেণ্টে ছিলেন।"

আমাদের সামনে এসে জমিদার আমায় অভিবাদন জানাল ; তারপর লুইয়ের দিকে ফিরে তার পানে হাত বাড়িয়ে দিল।

"কাপ্তেন লফেভারকে সম্ভাষণ জানিয়ে নিজেকে সম্মানিত মনে করছি ; আমাব বাবা তোমাদের রেজিমেণ্টেই কাজ কবতেন।"

লুই হাসল। "সত্যি ?" রহস্যভবে সে জিজ্ঞেস করল।

আমরা গল্প-গুজবে মেতে গেলাম।

"আমরা কিন্তু মা-ছেলে সবাই তোমাব পথ চেয়ে বসে আছি।" জমিদার বলল, "কবে আমাদের সৌভাগ্য হবে তোমাকে আমাদের প্রাসাদে নিয়ে যাবার ?"

"দিন পনের বাদেই সম্ভবতঃ।"

"আমার মামাও ওই সময় নাগাদ আসছেন ; ভালই হল ; অন্যথায় তুমি আমাদের ওখানে গিয়ে হয়ত বিরক্তি বোধ করতে।"

"উঁহু, মোটেই না।"

"তোমার কথা আমি অবশ্য বিশ্বাস করি। কারণ যার অন্তর সুন্দর, কোন কিছুতেই তার বিরক্তি আসে না।"

"তুমি যা বললে, তা খুবই সত্যি।" লুই অন্যমনস্ক ভাবে জলে নুড়ি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সায় দিল।

অনতিকাল পরেই আমরা বাড়ি যাবার জন্যে উঠে পড়লাম। যাবার আগে জমিদার লুইকে বলে গেল, "শীগগির তোমার সঙ্গে দেখা হবে আশা করি। আমার মামাও খুশী হবেন তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে।"

"ধন্যবাদ", জানাল লুই প্রসন্ন মনে। তারপর জমিদার অদৃশ্য হয়ে হয়ে গেল।

আজ সকালে লুই চলে গেল। আমরা সকলেই বড় মুষড়ে পড়েছি। মা অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি তাকে আলিঙ্গন-কালে; দশবার তাকে দিয়ে দিব্যি করিয়েছেন, শীগগির সে আবার আসবে। বাবা আর আমি পথের খানিকটা ওকে এগিয়ে দিতে গিয়েছিলাম। নীরবেই আমরা চলছিলাম, কারণ প্রিয়জনকে বিদায় জানানো—যতই "আবার দেখা হবে" বলা যাক—বড় দুরূহ। একসঙ্গে গির্জা অবধি গিয়ে লুই এগিয়ে গেল।

"আমায় ভুলবে না, বল?" লুই করমর্দন করবার সময় বলল।

"কক্ষনো না, নিশ্চিন্ত থেকো।"

"আর আমি," সে জানাল নিচু গলায়, "যদিও আর কোনদিন তোমার সঙ্গে দেখা না হয়, জীবনে তোমায় ভুলতে পারব না।"

"কিন্তু দেখা হবেই, আমি জানি তুমি ফিরে আসবে!" ওর বিষণ্ণ ভাব দেখে আমি জবাব দিলাম।

"আবার দেখা হলে তুমি সুখী হবে?"

"বিলক্ষণ! তুমি আবার এলে আমরা সত্যিই প্রীত হব, তাই না বাবা?"

"নিশ্চয়ই।" লুইয়ের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি।

ঘোড়ায় চেপে সে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গেল। বনের মাঝে অদৃশ্য হবার আগে ফিরে তাকিয়ে সে টুপি নাড়ল। দুই হাতে আমায় জড়িয়ে ধরে বহুক্ষণ বাবা আমার দিকে চেয়ে রইলেন। স্নেহময় পিতা—কী গভীর না তাঁর ভালবাসা! তাঁর চোখ দেখলাম ভিজে ভিজে।

"মা আমার নিষ্পাপ বনের ফুল!" শির চুম্বন করে তিনি অর্ধস্ফুট স্বরে বললেন। আমরা ফিরে চললাম।

"চল্ মা, মন খারাপ করে কি লাভ? আশা করি ও ওর কথামত শীগগির ফিরে আসবে।"

"আমিও তাই চাই বাবা, আর কয়েক দিন যদি ও থেকে যেত, বেশ হত, চলে যাওয়ায় বড় যেন ফাঁকা লাগছে।"

"ও চলে যাওয়ায় তোর মা বড় কাতর হয়ে পড়েছেন, ছেলেটাকে তিনি খুব ভালবাসেন, আর আমি—আমিও ওকে বড় স্নেহ করি।—তুই, মার্গরিৎ?"

"আমিও বাবা!"

লুই চলে যাওয়াতে সারা বাড়িটা ফাঁকা লাগছে। যদিও অল্প কয়েক-দিন ও ছিল আমাদের মধ্যে, তবুও ও চলে গেছে, মনে হচ্ছে বাড়িরই কেউ চলে গেছে। আজ সন্ধ্যাবেলা জমিদার-গিন্নী এসেছিলেন। বাবা মাকে তিনি অনুরোধ করলেন,—আমায় নিয়ে অবশ্যই তাঁরা যেন একবারটি প্রাসাদে যান। তাঁরা জানালেন যে এখন বোধ হয় তা সম্ভব হবে না। —আমার বাপু মনে হয় নিমন্ত্রণটা রক্ষা করলেই ভাল হত। কথায় কথায় জমিদার-গিন্নী বললেন যে তাঁর একটি পরিচারিকার বড় দরকার। আমি তখন জানেৎ কোরেন-এর উল্লেখ করলাম। তিনি তাকে দেখতে চাইলেন, এবং আমি কথা দিলাম যে জানেৎকে প্রাসাদে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে নির্দেশ দেব। যখন আমি কোরেনদের দুঃখ ও মেয়েটির নিষ্ঠার কথা বললাম, তিনি আকুল হয়ে কেঁদেই ফেললেন।

আমার ধারণা জানেৎকে তিনি কাজে বহাল করে নেবেন।

"এখনও এক মাস হয়নি তুই আমাদের কাছে এসেছিস, এরই মধ্যে তুই পেয়ে গিয়েছিস যত দীন-দুঃখীর হদিশ?" তিনি বিস্ময়-মিশ্রিত আনন্দে গদগদ হয়ে বললেন, "তুই যে একবারে সাক্ষাৎ দেবদূত—ওদের রক্ষাকর্ত্রী।"

বাবা আজ সকালে লুইয়ের একটা চিঠি পেয়েছেন। সে এখন পারিতে আছে, তবে শীঘ্রই আলজেরিয়া যেতে হবে। ডিসেম্বরে সে ফিরে আসবে; সে লিখেছে, "আপনাদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হব আশা করি। আপনি ও মাদাম আর্ভের যে অকুণ্ঠ যত্ন করেছেন আমার স্বর্গত পিতা-মাতা ও আমাকে, তা জীবনে বিস্মৃত হব না। আমার শোকসন্তপ্ত মুহূর্তে আপনাদের নিকট যে বাৎসল্য পেয়েছি সে ঋণ কখনও শোধ করবার ক্ষমতা আমার হবে না। স্বর্গের দেবতারা সে ঋণ শোধ করুন আর রক্ষা করুন আপনাদের সবাইকে সকল বিপদ-আপদ থেকে,—এই আমার প্রার্থনা। আমি দূরদেশে থাকাকালীন আমায় ভুলে যাবেন না যেন; অবশ্য এ কথা আপনাকে বলাই বাহুল্য। কারণ আপনিই আমার পিতার অভাব আর মাদাম আর্ভের আমার মাতার অভাব পূর্ণ করেছেন, আর আমি জানি, আপনাদের হৃদয়ের একাংশ চিরদিন অধিকার করে থাকবে—লুই লফেভার।"

আজ আমি জমিদার-গিন্নীকে নিয়ে গিয়েছিলাম জানেৎ কোরেনদের বাড়ি। গাস্ত‍ঁও সঙ্গে ছিল। মেয়েটিকে দেখে কঁতেস বড় সন্তুষ্ট হলেন। তখনই তাকে বহাল করে নিলেন। জানেৎকে পায় কে? আমার হাত ধরে সে কেঁদে ফেলল, ওর চোখে জল দেখে আমিও বেসামাল হয়ে পড়লাম; তবু ওকে শান্ত করতে সচেষ্ট হলাম। উঁচু গলায় তার মা-বাবা আমায় অজস্র আশীষ জানাতে লাগলেন। জানেৎ প্রাসাদে যাবে কাল থেকে। গাস্ত‍ঁ ফেরার পথে আমায় অভিনন্দিত করল, "তুমি সত্যি

বড় লক্ষ্মী মেয়ে।"

"নাঃ, আমি লক্ষ্মী হতে চাই, কিন্তু হলাম কই ?"

"যাঃ, আচ্ছা বল তো তুমি না থাকলে এই গরীব বেচারাদের অবস্থাটা কি হত ?" সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

"ভুলছ কেন—ভগবান তাদের কোনদিনই ছেড়ে যেতেন না। তাঁর সৃষ্ট জীবদের প্রতি অপার তাঁর ভালবাসা ; তিনি তাদের আপন সন্তান-রূপে দেখেন,—বাপ কি নিজের ছেলে-মেয়ে ছেড়ে থাকতে পারে ?"

চারিদিক স্তব্ধ।

"যাই হোক, মেয়েটি বড় সুন্দর," গাস্ত বলল।

"বেশ, তুমি আর আমি একমত জেনে বড় আশ্বস্ত হলাম ; ওর আয়ত চোখ দুটি কি চমৎকার না ? শরতের আকাশের মত নীল।"

"আচ্ছা, এটা কি তোমার অন্তরের কথা ?"

"বটে, তুমি কি বলতে চাও ?" আমি পালটা প্রশ্ন করলাম, চোখ তুলে দেখি দুষ্টুমিতে তার চোখ ভরা। সে হেসে ফেলল।

"আমার যা খুশি বলি যদি, তোমার কী বা এসে গেল ?"

ইতিমধ্যেই আমাদের বাগানের সীমানায় পৌঁছে গেছি ; ওরা বিদায় নিল।

কাল আমি প্রাসাদে যাব। সারা সকালটা কেটেছে গোছ-গাছ করতে। আটটা বাজল ঘড়িতে। জানলাটা খুলেই রেখেছি ; চকচকে তারাগুলো আমার দিকে তাকিয়ে আছে আর রূপোলী চাঁদটা ভাগ করে দিয়েছে আমার ঘরখানা আলো আর ছায়ায়। চারিদিক নীরব ; কোথাও টুঁ শব্দটি নেই, হাওয়া পর্যন্ত স্তব্ধ। আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। আমাদের কনভেন্টের ভগিনী ভেরোনিকের কথা মনে পড়ে গেল—চাঁদ দেখে। তিনিও রাতের ওই গ্রহের মতই ত নির্মল, সুন্দর, পাণ্ডুর ; জগতের কোলাহলের বহুদূরে, কনভেন্টের পবিত্র পরিবেশে

তিনি যাপন করছেন শান্ত নিবেদিত জীবন। কী তাঁর মহৎ চরিত্র! তিনি যে আমায় এত ভালবাসেন, তার জন্য আমি আন্তরিক সুখী; কারণ তাঁর মত স্নেহপ্রবণ নারীর ভালবাসা পাওয়ায় যে কী অপরিসীম তৃপ্তি! সর্বদা তাঁর দেওয়া ক্রুশটি আমি পরে বেড়াই।

প্লুয়ারভেনের প্রাসাদ; আমি আজ এই প্রাচীন প্রাসাদে বাস করছি; বড় ভাল লাগছে; একা যখন থাকি তখন এই অতিকায় প্রাসাদের মাঝে অনুভব করি এক শূন্যতা, কেমন যেন অবসাদ—যা আমায় আচ্ছন্ন করে দেয় বিষাদে, চিন্তায়। আমার স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত ব্যবস্থাই করা হয়েছে, সব কিছুই আমার মনোমত হয় যাতে, সেদিকে সবার নজর। গত কাল পাঁচটার সময় জমিদার ও তার ভাই আমায় আনতে গিয়েছিল; পেছন পেছন এসেছিল তাদের পরিবারের রাজকীয় গাড়িটা। হেঁটে গেলেই ভাল হয় বলাতে বাবা জোরে হেসে উঠলেন।

"গাড়িটা দেখে বুঝি ভয় করছে রে খুকী? পড়ে যাবার ভয়?"

জমিদারও হাসল।

"আমার কিন্তু মনে হয় মাদমোয়াজেল", সে বলল, "তোমার প্রস্তাবটা বেশ লোভনীয়।"

মার কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে স্বতই অশ্রু নেমে এল দুই গাল বেয়ে; বহু চেষ্টায়ও তা বাধা মানল না।

"যা বাছা, কাঁদতে নেই," তিনি বোঝালেন আমায়, "দেখা ত হবেই ঘন ঘন, আর এ সবই তোর ভালর জন্যে।"

বনের পথটাই সবচেয়ে ছায়াশীতল বলে আমরা সেদিক দিয়ে চললাম। আমার বাঁ দিকে জমিদার, অন্যদিকে তার ভাই। লুইয়ের প্রসঙ্গ উঠলে জমিদার তার সম্বন্ধে বিশদভাবে জানতে চাইল। গাস্তঁকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম জানেৎকে পেয়ে তার মা খুশী কি না। সে

জানাল যে ওর কাজে মন খুব আর রুচিও মার্জিত, কোনও কিছু বলার ফাঁক নেই। চারিধারের মনোরম দৃশ্যের দিকে জমিদার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অস্তসূর্যের সিঁদুরে আলোয় সেই লগ্নে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তমসাচ্ছন্ন ব্যথাতুর এই প্রাসাদ; বেরি ও গুল্মের ঝোপ এবং নানারকম ঘাসে ঢাকা একটি পাহাড় উঁকি মারছিল প্রাসাদের ঠিক পেছন থেকে। একটা বড় ক্ষেত পার হতে হল; অকৃপণ সূর্যের আলোয় পুষ্ট যব ওটের প্রাচুর্য চারিদিকে। গাছে গাছে পড়ে নি এখনও হেমন্তের হলুদ ছোপ, আজ অবধি এখানে চলছে গ্রীষ্মের রাজত্ব। কয়েকটি পাখি ও পাহাড়ের পাদদেশে মুখর একটি নদী ছাড়া আর সবই নীরব। প্রাচীন একটি খিলানের নিচে দাঁড়িয়ে জমিদার-গিন্নী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সস্নেহ আলিঙ্গনে তিনি আমায় নিয়ে গেলেন বসবার ঘরে।

"সোনা আমার, তোকে এখানে পেয়ে যে কী আনন্দ হল!" বলে তিনি ছেলেকে ধমক দিলেন, "হ্যাঁ রে হ্যানোয়া, তুই ওকে গাড়িতে আনলি না কেন রে?"

"মাদমোয়াজেল হাঁটতেই চাইছিল, আর কথাটা আমারও মনঃপূত হল বলে ওকে বাধা দিই নি।" বলে সে হাসল।

তিনি আমায় শুধালেন, "কিন্তু বাছা বলত, তুই ক্লান্ত হস নি?"

"মোটেই না। হেঁটে এলাম, বেশ ভাল লাগছে; বনের হাওয়াটা কী মিষ্টি!"—তারপর তিনি আমার বাপ-মার কুশল জানতে চাইলেন। তাঁর ভাই এসেছেন শুনলাম, কিন্তু কোথায় যেন বেরিয়েছেন, রাতে খাবার আগেই ফিরবেন।

"চল মা, তোর ঘরটা দেখিয়ে দিই। খাবার আগে একটু জিরিয়ে নে।"

তাঁর পেছন পেছন গিয়ে হাজির হলাম—তাঁর ভাষায়—'আমার ঘরে'। সামনের মাঠ থেকে অজস্র সুবাস, আর জানলার ধারে মিষ্টি

জুঁই ফুলের গন্ধে ঘরটা আমোদিত। ঠিক নিচেই এক অপূর্ব বাগান। দূরে, অনেক দূরে, একটা লম্বা নীল রেখা সূর্যের আলোয় ঝলমল করছিল : ওই ত সমুদ্র! অধীর হয়ে আমি ছুটে গেলাম কঁতেস-এর কাছে, জড়িয়ে ধরলাম তাঁকে।

"কি সুন্দর ঘরটা যে লাগল! আপনি সত্যি বড় ভাল!

তিনি অন্তরে অন্তরে অতি তৃপ্ত হলেন।

"যদি ভগবান করেন তবে তোকে চিরদিনের মত ঘরটা ছেড়ে দেব," চিন্তাকুল অথচ প্রসন্ন তাঁর মুখ।

তারপর তিনি বললেন, "যা মার্গরিৎ, এ যে তোর নিজেরই বাড়ি; তোর প্রসাধন যদি আমার আগেই শেষ হয়, অপেক্ষা না করে বিনা দ্বিধায় নিচে হলঘরে চলে যাস। ওখানে দেখিস তোকে পেয়ে সবাই কি কাণ্ডটা না করে।"

তিনি চলে গেলেন। আমি একা,—পাশের নিভৃত কক্ষে গিয়ে অভ্যাস মত আমি নতজানু হয়ে বসলাম, সেখানে রাখা ক্রুশের সামনে। ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানালাম তাঁর অসীম করুণার জন্য, আর প্রার্থনা করলাম, তাঁর চোখে যা ভাল শুধু সেটুকু করবার অধিকার তিনি যেন দেন আমাকে। হে ভগবান! ক্ষমা কর আমার সমস্ত পাপ, পাপ যে আমার অসংখ্য!—উঠে গেলাম, জানলার বাইরে তাকালাম; তারপর সাদা মসলিনের একটা কাপড় পরলাম, বাঁধলাম নীল সাটিনের একটা ফিতে। এই পোশাক আমার বাবার খুব পছন্দ; তৈরী হয়ে নিচে গেলাম।

হলঘরে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় দরজা খুলে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বয়স তাঁর পঞ্চাশের কাছাকাছি; মাথার চুল ও নিবিড় গোঁফে শুভ্রতার ছাপ পড়েছে, ছোট ছোট চোখ স্ফূর্তিতে ভরা। আমায় দেখে তিনি এগিয়ে এলেন ও করমর্দন করে সোৎসাহে বললেন : "তোমায় আমি চিনি মাদমোয়াজেল, তোমার কথা ঢের শুনেছি;

প্রায়ই আমার বোনের মুখে শুনি তোমার কথা ; তোমার প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি তোমার প্রশংসায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন,—আর এখন দেখছি তিনি ঠিকই বলেন। আমি হচ্ছি কর্ণেল দেক্রে।"

আমার মনে হল তিনি যেন আমার অন্তর অবধি দেখে নিচ্ছেন। কারণ একান্ত দৃষ্টিতে তিনি কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তার পর বললেন, "চল মা, বড় সন্তুষ্ট হলাম তোমায় দেখে ; ভেতরে চল।" আমায় হাত ধরে তিনি 'হলে' নিয়ে গেলেন। তাঁর পরিচয় পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম ; কারণ তাঁকে একটু রুক্ষ মেজাজী ও কাঠখোট্টা-গোছের কল্পনা করেছিলাম। কে জানত তিনি এত অমায়িক! হলঘরে দেখি জমিদার আর তার ভাই বসে আছে। খোলা জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম, ছাত-ভরতি নানারকম প্রতিমূর্তি আর দুষ্প্রাপ্য সুন্দর সুন্দর গাছপালা। কর্ণেল সাহেব ইতিমধ্যেই বেশ স্নেহাসক্ত হয়ে পড়েছেন মনে হল। জানেৎকে দেখে, আর সে সুখী হয়েছে জেনে পুলকিত হলাম। আমায় সে মধুর হাসি আর আয়ত নীল চোখের নীরব ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানাল।

আজ সকালে বাবা-মাকে দেখতে গিয়েছিলাম। কেমন করে তা সম্ভব হল বলছি। প্রাতরাশের সময় কর্ণেল সাহেব জানতে চাইলেন, আমি ঘোড়ায় চড়তে পারি কি না : পারি না শুনে তিনি জমিদারের দিকে ফিরে বসলেন, "কি রে ম্যুনোয়া, বিদ্যাটা ওকে শিখিয়ে দে না ?"

ও সানন্দে রাজী হয়ে গেল।

"আজ থেকেই তবে লেগে যাও, অবশ্য মাদমোয়াজেলের যদি অসুবিধে না থাকে ; এই সুবাদে তোমার মার সঙ্গেও দেখা করে আসতে পার…"

"বাঃ, তাহলে কিন্তু খুব মজা হয়…কিন্তু…"

"আর তবে দেরি নয়" বাধা দিলেন কর্ণেল।

"কিন্তু", আমি আবার বললাম, "আমি চড়তে পারি, তেমন শান্ত ঘোড়া কি আছে ?"

—"আলবৎ আছে", ফ্র্যানোয়া জবাব দিলেন। "বছরখানেক আগে মা একটা সাদা রঙের মাদী ঘোড়া কিনেছিলেন, ভেড়ার চেয়ে নিরীহ।"

"ভাবী জমিদার-বধূর কথা ভেবেই ওটি কেনা হয়েছিল, না বোন ?" ধূর্তস্বরে কর্ণেল ফোড়ন দিলেন।

কঁতেস হাসলেন, আর তাঁর বড় ছেলে চলে গেল সাজ-সরঞ্জাম করতে। গাস্তঁর অন্য কাজ থাকায়, সে আমাদের সঙ্গে যাবে না জানাল। প্রাতরাশের পর ঘোড়াগুলো এনে হাজির করা হল দরজার সামনে। জমিদারের ঘোড়াটার নাম সালাম্বঁা, কালো কুচকুচে তার রঙ; সাদা লোমের লেশমাত্র নেই; বিরাট চেহারা, জাঁকালো বুক। মনিবের গলা পেয়ে সে উল্লসিত হয়ে ডেকে উঠল। আমার জন্যে আনা ঘোড়াটা বরফের মত সাদা; কেশর যেন গলানো রূপো; সত্যিই ভেড়ার মত নিরীহ তার হাবভাব। একটি যেন শক্তি ও মহত্ত্ব; অপরটি সৌন্দর্য আর কমনীয়তা। ফতেমাকে গিয়ে আদর করাতে সে মৃদু ডাক ছেড়ে আমার হাত চাটতে লাগল—যেন বুঝতে পেরেছে যে, আমি ঘোড়া ভালবাসি। জমিদার রেকাবে পা দিয়ে অবলীলাক্রমে লাফিয়ে উঠল তার জিনের ওপর; কর্ণেল সাহেব তাঁর ঘোড়ায় সবশেষে চাপলে কঁতেস আমাদের শুভেচ্ছা জানালেন। "দেখিস ফ্র্যানোয়া, মার্গরিতের গায়ে যেন কুটোটি না লাগে", তিনি সতর্ক করে দিলেন।

"কিচ্ছু ভয় নেই মা", হাল্কা গলায় সে উত্তর দিল।

আমি জিনের ওপর ঠিকমত বসেছি কি না, সে দেখে নিল।

"খুব ভালভাবেই বসেছি!" আমি বললাম।

রূপোর কাজ-করা একটা চাবুক সে আমার হাতে দিল; কর্ণেল মুগ্ধকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন, "তুমি ত দেখছি খাসা চালাচ্ছ!"

আমি হাসলাম। কদম চালে আমরা শুরু করেছিলাম; খানিক

বাদেই তা দ্রুতগতিতে গিয়ে পৌঁছল। সাবধানতা অবলম্বন করে জমিদার আমার পাশে-পাশেই চলছিল। সকালটা কি সজীব, কি নীল আকাশ! আমার চেয়ে সুখী আর কে আছে? আমাদের বাগানের সামনে এসে কারও সাহায্য বিনা আমি স্বচ্ছন্দে লাফিয়ে পড়লাম ঘোড়া থেকে, এক ছুটে গিয়ে আঁকড়ে ধরলাম আমার বাবাকে। তিনি তখন চৌকাঠের সামনে পায়চারি করছিলেন।

"আরে"! তিনি অবাক হয়ে, গেলেন, "মা আমার ঘোড়ায় চড়ে এসেছে! বাঃ! দূর থেকে এক রণরঙ্গিনী ও দুইজন অশ্বারোহী যোদ্ধাকে এদিকে আসতে দেখে আমি ডাকলাম, বুঝি বা শ্রীমতী গোসরেল তাঁর অনুরাগীদের নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন।"

আমায় দেখে তিনি কেমন বিহ্বল হযে পড়লেন। মা ছুটে গেলেন জমিদার ও তার মামাকে অভ্যর্থনা করতে, আমি ঘোড়ায় চেপে এসেছি শুনে তিনিও আহ্লাদে আটখানা। ঘণ্টাখানেক বাদে আমরা প্রাসাদে ফিরলাম।

ছোট্ট নদীটির ধারে আজ গিয়েছিলাম আমরা। জমিদার নৌকা-বিহারের প্রস্তাব করাতে আমরা সোৎসাহে তা অনুমোদন করলাম। বুনো গোলাপ আর বঁইচি-ঝোপে ভরা দুই কূলের মাঝে সোল্লাসে ভেসে চললাম আমরা,—জমিদার, তার ভাই আর আমি। কি হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য! বহুদূরে, গাছের ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল প্রাসাদের আকাশচুম্বী চূড়া। ধারে-কাছে সবই নিস্পন্দ; নিজেদের কথা ছাড়া আর কিছুর শব্দই সেখানে ছিল না। থেকে থেকে লাল-নীল মাছেরা জলের ওপর দেখা দিয়েই তীরের মত ডুব দিচ্ছিল সবেগে। ঝোপ-ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে গোলাপের বাহারে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল। তুষার-শুভ্র একটা ফুল দেখে আমার পক্ষে লোভ সামলানো দায় হল; জমিদার অমনি ডাঙায় লাফিয়ে পড়ল সেটা আনবার জন্য। কিন্তু

পাড়টা এমন খাড়া যে তার পা পিছলে গেল ; আমি আঁতকে উঠলাম। গাস্তঁ ভাবে বিভোর হয়ে ঢেউ দেখছিল ; হঠাৎ সে চমকে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু ইতিমধ্যেই জমিদার টাল সামলে নিয়ে উঠে এল, হাতে তার সেই ফুল। "এ কি, তুমি এত বিবর্ণ হয়ে পড়েছ কেন? শরীর ভাল আছে ত?" শশব্যস্ত হয়ে সে আমায় ফুলটা দেবার সময় বলল।

"নাঃ, তুমি পা হড়কে পড়ে যাচ্ছিলে দেখে বড় ভয় পেয়েছি, বিশেষ কিছু না"।

—"ভয়ের কি আছে? আমি ত সাঁতার জানি," দ্যুনোয়া আমার মুখের কথা কেড়ে নিল, "আর বাপু ওই সাদা গোলাপের মত ফ্যাকাশে মুখ করে থেক না," হাসতে হাসতে সে অনুরোধ করল।

আমরা ফিরে এলাম প্রাসাদে ; গাস্তঁর মুখে সব শুনে কঁতেস আমায় সস্নেহে কোলে টেনে নিলেন।

আজ আমরা সন্ধ্যাবেলায় ছাতের ওপর খাওয়া সেরে নিলাম। বাড়ির ভেতরটা বেশ গুমোট লাগছিল। কঁতেস আর তাঁর ভাই ফিরে এলেন যখন, সিঁদুরবর্ণ সমুদ্রের বুকে সূর্য তখন পাড়ি জমিয়েছে। গোধূলির এই ম্লান দীর্ঘস্থায়ী আলো আমাদের যেন আহ্বান জানাচ্ছিল আরও কিছুক্ষণ বাইরে কাটিয়ে যেতে। গাস্তঁ ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়াল যাবার জন্যে। ভ্রূ কুঞ্চিত করে জমিদার তাকে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ততক্ষণে সে অনেকটা এগিয়ে গেছে। আমাদের সামনেই ফোয়ারা, তার মধ্যে লাল মাছের খেলা দেখছিলাম ; আমারই পাশে দাঁড়িয়ে জমিদার, আত্মবিস্মৃত ভাব। স্বচ্ছ জলে মাছের ছুটোপুটি দেখে আমি বলে উঠলাম, "কি মজা! কি সুন্দর!

সে হেসে বলল, "সত্যিই বড় সুন্দর ; জলের মধ্যে সত্যিই তোমার মুখের ছায়া পড়ে।"

"যাঃ, আমি যেন সে-কথা বলছি", অপ্রস্তুত ভাবে আমি বাধা

দিলাম, "আমি ত ওই সুদৃশ্য মাছগুলোর কথা বলছি।"

"আর আমি, আমি দেখছি সুদৃশ্য তোমার মোহন ছায়াটা!"

দারুণ লজ্জা করতে লাগল আমার; ওর প্রতিটি কথাই কানে যেন মাধুর্য ঢেলে দেয়! স্বরাট গলায় ঈষৎ খুশির আমেজ,—পাহাড়ের গায়ে ঢেউভাঙার মূর্ছনা যেন ভেসে আসে! রাত হয়ে এল; আমরা ভেতরে গেলাম। জমিদার-গিন্নী আমায় ধরে বসালেন, ওই অঞ্চলের প্রচলিত কিছু গান গাইবার জন্য। আমি গাইলাম। কর্ণেল সাহেব প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন।

"মা-মণি, তোর গলা শুনে মনে হল, গোলাপ-বনে যেন বুলবুলি গাইছে", তিনি বললেন, "এইবার দ্যুনোয়া, এইবার তোর পালা। একটা গান শোনা দেখি?"

অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে সে বেহালার বুকে ছড় টানল, তারপর শুরু করল ভিক্তর হ্যুগোর একটা গান; তার গুরুগম্ভীর গলায় সারা ঘর ভরে উঠল,—

"আকাশ-রসে পরিপ্লুত
আছে কি সেই শ্যামল-ভূমি?"

গানটা শেষ হলে কর্ণেল বললেন, "বাবা দ্যুনোয়া, গেল বছর তোর গান যা শুনে গিয়েছি, তার তুলনায় তোর অনেক উন্নতি হয়েছে।

গাস্ত এর মধ্যে ফিরে এসেছে; কিছুতেই সে গাইতে রাজী হল না। আমাদের আসর ভাঙল রাত এগারোটা নাগাদ। আমার ঘরে আমি ক্রুশের সামনে নতজানু হয়ে বসলাম। ভগবান যেন ক্ষমা করেন আমার সমস্ত পাপ, কখনও তিনি যেন আমায় ভুল পথে না যেতে দেন। হে ভগবান, আমি তোমারই দাসী; দয়া কর আমায়—জানলা খুলে তাকালাম বাইরে। ঝাউ আর বার্চ গাছের ওপর দিয়ে চাঁদ উঠেছে। পৃথিবী আজ শান্তিমগ্ন! দূর থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রের চাপা গর্জন। অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে রূপোলী ঢেউ! ঠিক ছিল, আসছে কাল আমি বাড়ি ফিরব;

কিন্তু কঁতেস আপত্তি করায় আরও দুদিন থেকে যেতে হচ্ছে।

জমিদার আর গাস্তঁর সঙ্গে আজ প্রাসাদের প্রতি অলি-গলি দেখে বেড়ালাম। কেল্লায় গিয়ে আমরা বুরুজটার ওপর বসে দেখলাম, দূরে নীল ঢেউয়ের মধ্যে কি ভাবে তলিয়ে গেল রাঙা টকটকে সূর্য!

"জান, এই দুর্গ সম্বন্ধে একটি কাহিনী চলিত আছে?" জমিদার বলল। আমি তাকে ধরে বসলাম, "কি কাহিনী বল না, লক্ষীটি!"

গাস্তঁ পায়চারি করছিল। জমিদার বলতে শুরু করল,—"দ্বাদশ শতাব্দীর কোনও এক সময়ে আমাদের জনৈক পূর্বপুরুষ থাকতেন এই প্রাসাদে; নাম তার আঁরি দ্য প্ল য়ারভেন। তখন তাঁর সন্তান বলতে ছিল রূপে স্বভাবে অতুলনীয় ষোড়শী এক মেয়ে। সে জমিদারের চোখের মণি। একটি ছেলেও ছিল; ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ধর্মযুদ্ধে সে যোগ দেবার পর বহু বছর তার কোনও খবর পাওয়া যায় নি। একদিন হয়েছে কি, একটি শীতের সন্ধ্যায় প্রাসাদে এসে হাজির হল অশ্বারোহী এক সৈন্য। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা! তাকে তাই তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে ডেকে আনা হল। বেচারার পোশাক বরফে একদম ঢেকে গিয়েছিল। সেকালের রীতি অনুযায়ী কাথেরিন—জমিদার-নন্দিনী—খুলে দিল সৈন্যটার কোমর-বন্ধনী। খাওয়ার সময় জমিদার আপ্যায়িত করে অতিথিকে বসালেন নিজের টেবিলে। লোকটার বয়স আন্দাজ পঁচিশ বছর। অঙ্গে কালো কুচকুচে বর্ম; টুপিতে কেবল একটা সাদা পালক, তুষারের মত ধবধবে সাদা। লম্বা চেহারা; আবলুশ-কালো কোঁকড়ানো চুলগুলি জুলপি অবধি লম্বিত; কপালের ওপর, চুলের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে একটা ক্ষতচিহ্ন; ঘন কালো গোঁফ আর এই দাগটা মিলিয়ে লোকটার মুখে এনে দিয়েছে সুন্দর পুরুষালি এক ভাব। কালো চিন্তা-কুল চোখ দুটি যে মাঝে মাঝে গৃহস্বামীর কন্যার দিকে পড়ছিল না, এমন নয়। মেয়েটিও প্রথম দৃষ্টিতে মুগ্ধ হয়; অশ্বারোহীর উন্নত চেহারার

দিকেই নিবদ্ধ ছিল তার স্বচ্ছ নীল চোখ—সকলের অগোচরে। তার নম্র নিষ্পাপ মুখ লাল হয়ে উঠছিল আগন্তুকের মৃদুতম সম্ভাষণ শুনে। তাকে জমিদার অনুরোধ জানালেন, দু-একদিন প্রাসাদে থেকে বিশ্রাম করে যেতে। সে যাবার সময় স্মৃতিচিহ্নরূপে দিয়ে গেল কাথেরিনকে সাদা একটি গোলাপ। "আবার দেখা হবে" না বলে সে বলে গেল, "বিদায়"! এই চূড়ার ওপর উঠে তাকে কাথেরিন অনুসরণ করেছিল আকুলতার দৃষ্টি দিয়ে, যতদূর সম্ভব। সেই মাথার পালক, সেই মনোহর গড়ন—সবই ক্রমশ ছোট হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেল এক সময়। এই বুরুজেই, তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল কাথেরিন। তার বাবা ভর সন্ধ্যা-বেলা তাকে কোথাও না দেখে খুঁজতে খুঁজতে এসে হাজির হলেন এখানে। ম্লান ও শুভ্র জ্যোৎস্নার ছটা এসে পড়ছিল খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে। বিছানায়—জমিদার দেখলেন—শুয়ে আছে তাঁর কাথেরিন, হাতের গোলাপটার চেয়েও বিবর্ণ। মাথার চুলগুলো চাঁদের আলোয় জ্যোতির্মণ্ডলের রূপ নিয়েছে। জমিদার তাকে ডাকতে গেলেন; দেখলেন, সব শেষ!

ঘ্যনোয়া বলে চলল, "লোকে বলে, ডিসেম্বরে শুক্লপক্ষের রাতে এখনও আজও সেই দৃশ্য দেখা যায়, যে-দৃশ্য দেখেছিলেন আমাদের পূর্ব-পুরুষ, জমিদার আঁরি!"

দারুণ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে চারিধারে; পাতার মধ্যে শুরু হয়েছে বাতাসের ক্রন্দন।

"ইস্, তোমার যে ঠাণ্ডা লাগছে", আমার গায়ে একটা চাদর জড়াতে জড়াতে জমিদার বলল, "হাত দুটো দেখছি একদম জমে গিয়েছে! চল, এবার আমরা ফিরি!"

আমরা নেমে এলাম।

কর্ণেল আজ সকালে পারি চলে গেলেন। ২০শে ডিসেম্বর—

জমিদারের জন্মদিন—এর আগেই তিনি ফিরবেন, কথা দিয়ে গেলেন তাঁর বোনকে। চৌকাঠের সামনে আমার হাত ধরে কপাল চুম্বন করবার সময় তিনি বলে গেলেন—

"মা-মণি, আমার মত বুড়ো ছেলেকে বাধা দিতে নেই ; শ্রীমান হ্যানোয়া হলে না হয় অন্য কথা, তাই না ?"

হাঃ হাঃ করে তিনি হেসে উঠলেন। আমি দারুণ লজ্জায় পড়লাম।

কালকেই আমার যাবার দিন। আঃ! আবার বাবা-মার কাছে ফিরব—ভাবতেও আনন্দ। কঁতেস আমায় বার বার অনুরোধ করেছেন, যেন জমিদারের জন্মদিনে আবার প্রাসাদে আসি। জমিদার নিজেও বহুবার বলেছে।

"তুমি আসবে ত, ঠিক বল। নইলে, জানই ত, তুমি ছাড়া সবই কত অনর্থক ঠেকবে, তাই না মা ?"

"তা কি বলতে ? আসিস কিন্তু মার্গরিৎ!"

আমি কথা দিলাম।

এই ত ফিরে এসেছি ছোট্ট আমার ঘরে, এই ত সেই চিরপরিচিত ঘর, যার জানালা খুললেই চোখে পড়ে আমাদের বাগানটা। সাদা পর্দায় ঘেরা এই ত আমার বিছানা, এই ত ছোট্ট টেবিলটা, যার ওপর আমি এই দিনপঞ্জী লিখি।

জমিদার আর তার ভাই আমায় পৌঁছে দিয়ে গেছে। বাবা দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ; আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরতে তিনি বললেন, "মনে হচ্ছে যেন এক সপ্তাহ নয়, বছর খানেক হল তুই আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলি অনেক দূরে।" মুখে হাসি থাকলেও চোখ দুটি তার ভেজা।

মা নিজের ঘরে কাজ করছিলেন, ছুটে গিয়ে হাজির হলাম সেখানে ; তিনি চমকে গেলেন, "সে কি রে ? আমি ভেবেছিলাম সন্ধ্যের আগে

তুই ফিরবি না। কে পৌঁছে দিল?”

“জমিদার আর গার্ত।”

তিনি তর তর করে নেমে গেলেন হলঘরে, আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। জমিদার ওর মায়ের দেওয়া একটা চিঠি তাঁর হাতে দিল আর বার বার তাঁকে এবং বাবাকে নিমন্ত্রণ জানাল ওর জন্মদিনে প্রাসাদে যাবার জন্য। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে মা-বাবা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি, বাবার ভাষায়, “আমার সংসার” দেখতে গেলাম। খরগোশগুলো দেখে লুইয়ের কথা মনে পড়ে গেল। রাতে খাবার সময় বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম লুইয়ের কোনও খবর এসেছে কি না।

মার দিকে চেয়ে তারপর তিনি জবাব দিলেন, “হ্যাঁ, আজ সকালেই ওর চিঠি পেয়েছি।”

“ও ভাল আছে ত?”

“হ্যাঁ।”

“এখন কোথায় আছে বাবা?”

“কর্সিকায়।”

“তাই নাকি? জায়গাটা কেমন লাগছে? চিঠির খানিকটা পড়ে শোনাও না বাবা!”

কয়েক লাইন পড়েই তিনি থেমে গেলেন।

“আর লিখেছে এখানে কাটানো দিনগুলির মধুর স্মৃতি সম্বন্ধে।”

চিঠিটা ভাঁজ করে তিনি পকেটে পুরে ফেললেন। শুতে শুতে বেশ রাত হয়ে গেল; কত কথাই যে জমেছিল এই কয় দিনে!

কাল সন্ধ্যায় জমিদার এসেছিল; জানতে চাইল এতটা পথ চলে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি কি না। মা ওকে পারী থেকে আনা নতুন কয়েকটা বিদেশী গাছ দেখালেন। সে তাঁকে লুইয়ের খবর জিজ্ঞাসা করল।

"আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে উদ্‌গ্রীব," জমিদার তাঁকে বলল, "এমন উদার চরিত্র বড় একটা দেখা যায় না। কি সরল দৃষ্টি কি প্রাণখোলা হাসি,—দেখেই ভালবাসতে ইচ্ছা করে।"

"অক্টোবর নাগাদ ও বোধ হয় আসছে।"

"সত্যি ? আমি সাগ্রহে অপেক্ষা করছি ওর জন্যে,—আমার মার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।"

লুইয়ের জীবন-কাহিনী সবিস্তারে মা ওকে বললেন। এক মনে শুনতে শুনতে জমিদারের সুন্দর মুখে নেমে এল চিন্তার ছায়া।

"বেচারা !" অধীর হয়ে ও বলে উঠল, "কত সংঘাতের মধ্যেই না ওকে দিন কাটাতে হয়েছে। এই করুণ ইতিহাস শুনে ওর ওপর বড় মায়া লাগছে। এই অল্প বয়সে, এত বাধা তুচ্ছ করেও ও আজ কাপ্তেন।"

"বয়স ওর কুড়িও হয়েছে কি না সন্দেহ! ওর রেজিমেণ্টে কাপ্তেনদের মধ্যে ও-ই সবচেয়ে ছোট।" সগর্বে মা উত্তর দিলেন। খানিক কথাবার্তার পর জমিদার চলে গেল।

আমার অস্ত্যারলিজের চেয়ে ভাল ঘোড়া আর ক'টাই বা আছে ? বাবা আমায় বড় ভালবাসেন। ঘোড়ায় চড়তে শিখেছি দেখে তিনি পারী থেকে আমায় আনিয়ে দিয়েছেন তেজী ঘিয়ে-রঙের এই ঘোড়াটা। কি কেশরের বহর ! আর স্বভাবটা ওর অতি নিরীহ ; আমায় দেখা মাত্র চন্‌-মন্‌ করে ওঠে। কাল ওকে কেনা হয়েছে ; আজ আমরা সারা গ্রাম ঘুরে বেড়ালাম। ও ছোটে হাওযারও আগে। বাবা আর আমি যখন যাচ্ছিলাম, জমিদারের সঙ্গে দেখা হল ; তার মুখে ত অস্ত্যারলিজের প্রশংসা ধরে না। যাবার সময় ও রহস্য করে গেল, "মনে হচ্ছে শিকার থেকে ফিরছেন দেবী ডায়ানা স্বয়ং।"

আজ ভগিনী ভেরোনিকের একটা চিঠি পেলাম। তাঁর অসুখ করেছে ;

খুব বাড়াবাড়ি ; বাঁচার আর আশা নেই ; অবিলম্বে আমায় দেখতে চান তিনি। ছোট্ট চিঠিটা দিব্য শান্তির মাঝে একান্ত একটি জীবনের সুবাসে ভরপুর। বেচারী ভগিনী! এই ত সবে ছাব্বিশে পা দিয়েছেন,—এরি মধ্যে উনি ছেড়ে যাবেন এই স্নেহের নীড় যেখানে আমরা সবাই প্রতিপালিত হচ্ছি ভগবানের দয়ার মধ্যে? বাবা অনুমতি দিয়েছেন ভগিনীকে দেখতে যাবার ; মা ত চিঠিটা পড়ে কেঁদে আকুল। প্রাতরাশের পর দশটার সময় আমরা বেরিয়ে পড়ব।

আঠারো তারিখ সন্ধ্যা নাগাদ আমরা 'মাতের দোলোরোজা' (Mater Dolorosa) কন্‌ভেণ্টে গিয়ে পৌঁছলাম। রোগিনীর ঘরে গিয়ে দেখি তিনি শুয়ে আছেন, আমায় দেখে হাসলেন, ইশারায় কাছে ডাকলেন। নতজানু হয়ে তাঁর শিয়রের কাছে গিয়ে বসলাম। আমায় তিনি আদর করলেন, অতি পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছে ওঁর চেহারা! হাতীর দাঁতে তৈরী একটা ক্রুশ ওঁর হাতে। আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছি দেখে উনি সস্নেহে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ রে মার্গরিৎ, তুই তা হলে সত্যিই আমায় ভালবাসতিস? কাঁদিস না বোন্, একমাত্র স্বর্গে গিয়েই আমি একান্ত সুখী হতে পারব ; সেখানেই আবার তোর সঙ্গে দেখা হবে একদিন। এই জগতে বড় দুঃখ রে মার্গরিৎ, বড় ব্যথার এই জগৎ। কিন্তু পরম পিতার চরণতলে—সেখানে নেই শোক, নেই ক্রন্দন, নেই পরিশ্রম ; সেখানে আমাদের সবার অশ্রুই ভগবান মুছিয়ে দেবেন।"

উনি থামলেন। আমাদের ত্রাণকর্তার করুণাপূত প্রতীকের ওপর ওঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। আবার উনি মুখ খুললেন।

"এই দেখছিস মার্গরিৎ, এই ক্রুশটা? কত বার যে এর আশ্রয় নিয়ে জীবনে সান্ত্বনা পেয়েছি! আমার ইচ্ছে, আমার সঙ্গে এটাও যেন কফিনে দেওয়া হয়।"

আমি অঝোরে কাঁদতে লাগলাম।

"মার্গরিৎ, বুঝলি, কি অপরিসীম শান্তি যে পাচ্ছি এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে যেতে ; বড় বেদনার মাঝে দিন কেটেছে বোন ! এবার ওদের সবাইকেই ফিরে পাব ,—বাবাকে, আমার মাকে, আর ব্যারনারকে।"

আমি সারা রাত ওঁর ঘরে কাটালাম ; ভগিনী দর্কাস-ও ছিলেন। ভগিনী ভেরোনিক আজ এত আনন্দ পাচ্ছেন এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে ! আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না ! 'তিক্ত দিনের মাঝেও কি নেই মধুর দিনের স্মৃতি ?'

এ-অবধি কোন দিন আমি দুঃখ পাই নি ; অতি সুন্দর এই জগৎ !—সকালবেলা, সূর্যোদয়ের সময় উনি ডাকলেন। "মার্গরিৎ, আছিস ?"

"হ্যাঁ ?"

"আয় বোন, কাছে আয়।"

আমি ওঁর গা ঘেঁষে বসলাম ; হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওঁর শীতল শুভ্র হাত দুটি !

"ভগিনী ক্ল্যার", পার্শ্ববর্তিনীকে উনি বললেন, "জানলাটা খুলে দে বোন, দিনের সূর্য দেখে যাই।"

অবিলম্বে জানলা খুলে দেওয়া হল। ছোট্ট ঘরটা ভোরের উজ্জ্বল আলোয় হেসে উঠল, দীপাধারের ক্ষীণ শিখাটি কেঁপে উঠছে, এবার বুঝি নিবে যায় ! ভগিনী ভেরোনিক সূর্যের দিকে তাকিয়েছিলেন, রোদ পড়ে বিবর্ণ মুখ তাঁর উদ্ভাসিত !

"আরও তেজোদ্দীপ্ত একটি দিনের দেখা পাব এবার, যেখানে ন্যায়ের সূর্য ওঠে স্বাস্থ্যের রশ্মি ছড়িয়ে !"

হাত দুটি তাঁর প্রার্থনার ভঙ্গিতে যুক্ত ; ভগিনী ক্ল্যারকে ডাকলেন, "বোনটি, ফাদার অগুস্ত্যাঁকে একবার দেখতে চাই।"

সে বেরিয়ে গেল। ভেরোনিক নিজের মুঠোয় তুলে নিলেন আমার হাত।

"মার্গরিৎ, তোকে যত যাতনা দিয়েছি, তার জন্যে আমায় ক্ষমা

করবি ত ?"

"আপনি ? আপনি ত আমায় চিরদিন স্নেহ আর ভালবাসাই দিয়ে এসেছেন ; আমিই বরং আপনার কাছে ক্ষমা চাই !" আমি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দিলাম।

ফাদার এলেন ; নতজানু হয়ে বসলেন পরলোক-যাত্রিণীর পাশে ; শুরু করলেন প্রার্থনা। আধ ঘণ্টা কেটে গেল। নিশ্বাস প্রায় থেমে এসেছে, চোখ দুটি বন্ধ। এক মিনিটের জন্য পাদরী থামলেন। ভেরোনিক চোখ খুললেন ; বিড়-বিড় করে বললেন, "হে যীশু, ত্রাণকর্তা !" পরম শান্তির মাঝে আত্মা ত্যাগ করে গেল তার তনু-গৃহ। পাদরী উঠে দাঁড়ালেন ; নীচু গলায় ঘোষণা করলেন।

"আমাদের ভগিনী চিরবিশ্রাম লাভ করেছেন ; ভগবান গ্রহণ করুন তাঁর আত্মা।"

ভগিনীকে সৎকার করতে দেখলাম চোখের সামনে ; দেখলাম তাঁকে কফিনে ; বুকের ওপর ন্যস্ত হাতে ধরা আছে ক্রুশটি ; অচেনা এক জ্যোতিতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল, ওষ্ঠে হাসির আমেজ ; নিদ্রিত বলে ভুল হয় ; পরনে সাদা পোশাক। নীরবে অশ্রু ঝরে পড়ছিল আমার গাল বেয়ে। মনে হল, দেবদূতরা নেমে এসেছেন এই ঘরে, ঘিরে আছেন পুণ্যাত্মাকে। উপস্থিত সকলে কফিনের ওপর এনে রাখলেন নিজের নিজের উপহার ; আমি দিলাম একটি লিলি ; সকালেই ওটি তুলে এনেছিলাম। বড় বড় সাদা মোমবাতি জ্বলছিল। প্রার্থনা-গৃহের গম্বুজের তলায় ওঁকে নিয়ে যাওয়া হল ; সবাই প্রার্থনা করল। অনুষ্ঠানের শেষে বাড়ি ফিরলাম

আগেই বলেছি, ভগিনী ভেরোনিক ছিলেন আমার বড় বোনের সামিল। কত দিন কনভেণ্টে ছিলাম, উনিই ছিলেন আমার একমাত্র সঙ্গী, শিক্ষয়িত্রী। এখনও কানে বাজছে ওঁর মধুর গলা, এখনও যেন আমায় বাইবেল পড়াচ্ছেন। মনে হত উনি যেন স্বর্গের অপ্সরী ! তাঁর বাসের অযোগ্য এই পৃথিবী ; কত কষ্টই না পেয়ে গেলেন এখানে ! ওঁকে সর্বময়

ভগবান নিজের কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছেন, যাতে করে ধ্বনিত হতে পারে তাঁর স্তবগান অনন্তের কানে।

আজ সকালে আমি বুড়ো কোরেন ও তাঁর স্ত্রীকে দেখতে গিয়েছিলাম। দেখি ওঁদের কুটির থেকে কে যেন বেরিয়ে যাচ্ছে। ও কি! গাস্তঁ! গরীব-দুঃখীদের কথা ও ভাবছে দেখে বড় স্বস্তি পেলাম। ওকে কথাটা বললামও। শুনে ও বেশ লজ্জা পেল। বাবা-মা কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করেই চলে গেল। কুটিরে জানেৎকে দেখে যেমন আশ্চর্য লাগল, তেমনি উৎফুল্লও হলাম। ওরা তখনও গাস্তঁ সম্বন্ধে আলোচনা করছিল। আমার জন্য জানেৎ গিয়ে হন্তদন্ত হয়ে চেয়ার নিয়ে এল। প্রাসাদে কাজ পাবার পর ওদের অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে দেখলাম। ওর বাপ আমার প্রশংসায় আবার পঞ্চমুখ হয়ে উঠছেন দেখে তাঁকে হাসতে হাসতেই আমি ধমক দিলাম, "দেখুন, যদি অমন করেন, আমি এখুনি চলে যেতে বাধ্য হব।"

ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন। ওদের সঙ্গে বহুক্ষণ গল্প করে আমি বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

আজ প্রত্যুষে বাবা আর আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম। স্বচ্ছ শিশির-কণায় পায়ের তলার জমি ঝলমল করছিল। অন্ধকার বন থেকে বার হতেই আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল কাঁচা রোদ-মাখানো ধুধু মাঠ দেখে; সামনেই একটা টিলা দেখে তার ওপর গিয়ে উঠলাম। নিচে দেখা যাচ্ছে গ্রাম, বেড়ায় ঘেরা আমাদের সাদা বাড়ি, —আর রক্তিম দিগন্ত দ্বিখণ্ড করে দাঁড়ানো প্লুয়ারভেন প্রাসাদের অতিকায় চূড়া; আরও দূরে দেখা যাচ্ছে সমুদ্র, যেখানে সূর্যের আলো পড়ে সৃষ্টি হয়েছে যেন সোনা আর রুপোয় গড়া হাজার তারার জেল্লা। প্রাতরাশের সময় আমরা বাড়ি ফিরলাম। মা দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে

ছিলেন ; বাবার হাতে একটা চিঠি দিয়ে বললেন, "লুইয়ের চিঠি !" বিনা বাক্যব্যয়ে বাবা সেটি পকেটে পুরলেন দেখে আমি একটু আশ্চর্য হলাম। কারণ ওর চিঠি হাতে পড়ামাত্রই বাবা পড়ে ফেলেন। যাক, ও নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই এখন, যা খিদে পেয়েছে !

আজ জমিদার এসেছিল। মাকে ও ধরে বসল, সামনেই ওর জন্মদিন, ওর মা একা হাতে সব-কিছু পেরে উঠছেন না, আমি যদি তাঁকে সাহায্য করতে প্রাসাদে যাই। ইতিমধ্যে মাদাম গোসরেল আর তাঁর মেয়েও এসে হাজির। জমিদার জানতে চাইল, আমি নিয়ম মত ঘোড়ায় চড়ছি কি না।—"নিশ্চয়ই !" আমি উত্তর দিলাম।

"চল না, একটু বেড়িয়ে আসতে আপত্তি আছে ?"

"বিন্দুমাত্র না !"

মাদাম গোসরেল ঠেস দিয়ে মন্তব্য করলেন। "সে কি জমিদার মশাই ! ব্যাভারটা কি খুব ভাল হল ? আমরাও এলাম, আর তুমিও উঠছ !"

ও চুপ করে রইল দেখে তাঁর উৎসাহ বেড়ে গেল।

"বলি, শতাব্দীখানেক ত হল আমাদের ছায়া মাড়াও না।"

ও তখন জবাব দিল, "দেখুন, লোকের বাড়ি ঘুরে বেড়ানোর সময় আমার হাতে একদম নেই।"

ঘরে গিয়ে আমি ঘোড়ায় চড়ার পোশাক পরে এলাম। হ্যনোয়া উঠে পড়ল, "দেখবে আজ কি রকম দৌড়টা হয় !"

বাবা জুতো পরতে গেলেন। তিনিও আসছেন আমাদের সঙ্গে। শ্রীমতী গোসরেল এল আমাদের এগিয়ে দিতে ; হ্যনোয়া আমায় জিনের ওপর বসিয়ে দিল ; তারপর চেপে বসল নিজের ঘোড়ায়।

"তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে কোনও পৌরাণিক যুগে আমরা ফিরে গিয়েছি," শ্রীমতী গোসরেল টিপ্পনী কাটল। "অপূর্ব তোমার এই

রণরঙ্গিনী মূর্তি, মার্গরিৎ! এবার থেকে কিন্তু আমার সঙ্গেও তোমায় বেড়াতে যেতে হবে ঘোড়ায় চড়ে।"

বাবা এসে গেছেন দেখে আমরা রওনা দিলাম। একেবারে পাশের গাঁয়ে গিয়ে ঘোড়া থামালাম। বাড়ি ফিরলাম পাক্কা তিন ঘণ্টা ছুটোছুটির পর। আমাদের বাড়ি অবধি জমিদার পৌঁছে দিয়ে গেল।

মা আর আমি আজ গাঁয়ের স্কুলমাস্টার ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। নদীর ধারেই ওঁদের বাড়ি। সারা বছরে ভদ্রলোকের রোজগার আন্দাজ আশী টাকা। স্ত্রী বাড়ির দেখাশোনা করেন; ঘরে তিনটি সন্তান, বড় ছেলের বয়স বছর আষ্টেক, সর্বদাই ছায়ার মত বাপের কাছে কাছে ঘোরে। তারপর হেলেন, ছয় বছরের মেয়ে; দাদা ক্লদের কথা বলতে অজ্ঞান। কোলের ছেলেটার বছর দুই বয়স হল, গোলগাল হাসিখুশী চেহারা। আমরা যেতেই মাদাম ভালূপোয়ান সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বড় ছেলে ক্লদকে নিয়ে মাস্টারমশাই স্কুলে গিয়েছেন। বাপ পড়াতে, ছেলে পড়তে। মাদাম ভালূপোয়ান তাঁর ছোট্ট বাগান দেখাতে নিয়ে গেলেন মাকে। আমি রইলাম বাচ্চাটার কাছে, দোলনায় শুয়ে শুয়ে ওর আর হাসির বিরাম নেই। খানিক বাদেই হাততালি দিতে দিতে ঘরে এসে ঢুকল হেলেন, মেয়েটার খুশি যেন উপচে পড়ছে।

"তুমি আমাদের জন্যে চকোলেট আর লজেঞ্চুস এনেছ বুঝি?" বলতে না বলতেই আমার কোলে উঠে ও পকেট হাতড়াতে গেল। ওর জিনিস মিলে গেলে পরম কৃতজ্ঞতায় আমায় চুমু খেল।—"লজেঞ্চুসগুলো আমি কিন্তু খেয়ে ফেলছি।" ও বলল।

"লক্ষীটি, সবগুলো খেয়ো না যেন; এক ভাগ রাখ ক্লদের জন্যে। স্কুল থেকে ফিরে এসে ওগুলো পেয়ে দাদা কত খুশী হবে বল ত?" আমার কথামত ও তাই করল।

"জান, মা-মণি সেদিন আমায় বেশি লজেঞ্চুস খেতে মানা করছিল, না কি অসুখ করে। আচ্ছা, তুমি কি বল? সত্যিই কি ওতে অসুখ হয়?" আমায় পেয়ে বসল ও।

"খুব সত্যি, তুই যদি বেশি লজেঞ্চুস খাস, নির্ঘাত শরীর খারাপ হবে। অসুখ হলে কি ভাল লাগে?"

"ছ্যাঃ, বাবার সেদিন অসুখ করেছিল; সারাটা দিন সেদিন শুয়ে কাটাতে হল, থেকে থেকে কি কাৎরানি আর কাঁপুনি! মা বলছিল, খুব বেশি খাটুনির এই ফল; কই মা ত বলল না বাবা লজেঞ্চুস খেয়ে অসুখে পড়েছেন?"

এই ভাবেই আধ-ঘণ্টাখানেক কাটল; ময়নার মত অনর্গল ওর পুঁজি; একটু পরে ক্লদ আর ওর বাবা এলেন। আমার কোল থেকে ঝাঁপিয়ে ছুটে গেল মেয়েটা দাদাকে লজেঞ্চুস দিতে। মঁসিয়ে ভালপোয়ান করমর্দন করলেন; ছেলেদের তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন; তাই তাদের সঙ্গে যদি কেউ ভাল ব্যবহার করে, অমনি তাকে আত্মার আত্মীয় বলে উনি মেনে নেন।

"শ্রীমতী আর্ভের! আপনিই কিন্তু হেলেনের মাথাটা খাবেন", হেসে উনি বললেন, "মেয়েটার মুখে অষ্টপ্রহর ত আপনার কথাই লেগে আছে। আপনি কত যে স্নেহপ্রবণ, সহজেই অনুমান করা যায় ছোটদের সঙ্গে আপনার ব্যবহার দেখে। আর ওদেরও ধন্যি বলি; আপনাকে দেখেই কেমন চিনে নেয়।"

দোলনা থেকে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলেন উনি, "একে কেমন দেখছেন বলুন ত?"

সত্যি বলতে কি বাচ্চাটা অপরূপ দেখতে; কোঁকড়া কোঁকড়া বাঁদামী চুল, বড় বড় কালো দুটি চোখ। আরও আধঘণ্টা বাদে আমরা বাড়ি ফিরলাম। যেতে যেতে মা বললেন যে জমিদার, তার মা ও ভাই প্রায়ই এখানকার স্কুল দেখতে আসেন। বড় সহৃদয় জমিদার। সবদিকে

ওর সমান নজর।—কাল আমরা গোস্‌রেলদের সঙ্গে পিকনিকে যাব।

বিখ্যাত 'গোলাপবাগানে' আমরা কাল পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি বহু লোকের ভিড়; নিমন্ত্রিতদের মধ্যে জমিদার-বাড়ির কাউকে দেখলাম না। শ্রীমতী গোস্‌রেল আমায় স্বাগত জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল।

"এখানে আমাদের পরিচিত বন্ধু-বান্ধবরাই রয়েছে; এমন কেউ নেই যাকে তুমি চেন না।"

এদের এক আত্মীয়, মঁসিয় লাঁস, মহা পণ্ডিত; বাবা তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন; আমায় দেখে উনি প্রশ্ন করলেন, "কি জেনেরাল, এটিই বুঝি আপনার মেয়ে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

ভদ্রলোক আমায় বিনীত নমস্কার জানালেন। তার পর ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে আমাদের নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন একটি টিবির ওপর; সেখানে প্রাচীন কেল্টিক পুরোহিত সম্প্রদায়ের কিছু ভগ্নস্তূপ রক্ষিত আছে। অত বড় পণ্ডিত তিনি; খুব মন দিয়ে ওঁর ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করছি; আমার এই মনোযোগ দেখে উনি প্রীত হলেন। শ্রীমতী গোস্‌রেল খানিক বাদে আমাদের দলে এসে ভিড়লো।

হাসতে হাসতে ও বলল, "দাদাবাবু, কেন আর বেচারীকে উত্ত্যক্ত করছ তোমার পাণ্ডিত্যের গুঁতোয়?"

"দূর," আমি প্রতিবাদ করলাম, "এ-সব আমার খুব ভাল লাগে।"

মঁসিয় লাঁস বিজয় দর্পে চেঁচিয়ে উঠলেন, "শুনলে দিদি, শুনলে?"

হাজার কথার মাঝে হঠাৎ জমিদার-গিন্নীর গলা শুনতে পেলাম, "বড় দেরি হয়ে গেল বাপু, ছ্যনোয়ার হাতে কাজের আর যেন শেষ নেই!"—আর একটি গলা, শুনেই চিনতে পারলাম।

"কই, শ্রীমতী আর্ভের বুঝি আসেন নি? জেনেরাল কই?"

"হ্যাঁ, ওরা এসেছে, মার্গরিৎ ওর বাবার সঙ্গে কোথায় কোথায় ঘুরছে, জানি নে বাপু!" মার চিন্তিত গলা ভেসে এল।

জমিদার! জানতে চাইছে আমি এসেছি কি না? আনন্দে অধীর হয়ে উঠলাম আমি। শ্রীমতী গোস্‌রেলের বুকনি বা ম'. ল'াসের কচকচি এক বর্ণও আমার কানে ঢুকল না। একটি স্পর্শ আমার কাঁধে অনুভব করলাম। দেখি বাবা। গম্ভীর ভাবে তিনি গোস্‌রেলের কথা শুনছিলেন। মিনিট খানেক বাদেই দেখি ঝোপের বাধা কাটিয়ে এগিয়ে আসছে—জমিদার।

"আরে, শ্রীমতী আর্ভের, তুমি এখানে? আমি ত তোমায় চারদিকে খুঁজে হায়রান!"

শ্রীমতী গোস্‌রেলের দিকে ও তাকাল; চলল করমর্দন।

"যা, কঁতেস্‌-এর সঙ্গে দেখা করে আয়," বাবা আদেশ দিলেন। আমি পা বাড়ালাম; পেছনে জমিদার।

"অস্ত্যারলিজের খবর কি?"

"বেশ ভালই আছে।"

জমিদার-গিন্নীর সঙ্গে করমর্দন করলাম; তারপর আলিঙ্গনের পালা, "আর মা, কি সুন্দর যে লাগছে তোকে; তাই না রে, হ্যনোয়া?"

"একশবার!"—ও হেসে ফেলল।

অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন উনি এই উত্তর শুনে।

আমার হাত ধরে তিনি গিয়ে বসলেন নদীর ধারে, যেখানে আর সবাই জটলা করছিল। শ্রীমতী গোসরেল বসল আমার পাশেই।

"এ বার থেকে তোমায় মার্গরিৎ-এর বদলে 'Rose' বলে ডাকলেই হবে। অমন রঙের বাহার দেখে গোলাপ বলেই ডাকতে সাধ হয়!" ও খোঁটা দিল। ঘাসের ওপরে পাতা সাদা চাদরটার চার ধারে আমরা বসলাম। আমায় বাঁ দিকে গাস্ত', ডান দিকে শ্রীমতী গোসরেল; তার ডান পাশে জমিদার; বাবা বসেছিলেন কঁতেস্‌-এর পাশে, আর পণ্ডিতমশাই মার পাশে। কথায় কথায় গাস্ত' বললে যে বহুদিন ইচ্ছে

থাকা সত্ত্বেও আমাদের ওখানে যেতে পারে নি,—তার জন্যে ক্ষমাও চাইল, "বুঝলে, এ-কদিন এত কাজ ছিল।"

দিনটা বেশ মজায় কাটল। সূর্যাস্তের পর কঁতেস্, তাঁর দুই ছেলে, আর আমরা—সবাই একসঙ্গে ফিরলাম। বাবাকে একটু গম্ভীর লাগল। বাড়ি ফিরে তিনি আর মা ওঁদের ঘরে বসে কি নিয়ে আলোচনা করছেন শুনতে পেলাম। অবিলম্বে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নের ঘোরে যেন একটা শব্দ কানে এল, দেখি আমার ওপর ঝুঁকে মা আমায় আদর করছেন। তাঁকে আমি জড়িয়ে ধরলাম। আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় আমি বিড়-বিড় করে বলে উঠলাম, "মা, মা-মণি!"—উনি চলে গেলেন।

আমি তখন সুখের স্বপ্নে বিভোর।

আজ মাসের শেষ দিন! কন্‌ভেণ্টে গিয়ে দেখে এলাম ভগিনী ভেরোনিকের কবর। মাটির ওপর ঘাস গজিয়েছে, শ্বেত পাথরের ক্রুশটায় লেখা: "২৬ বৎসর বয়স্কা ভগিনী ভেরোনিকের স্মৃতিতে।"

"আজ যে তুমি অশ্রুরুদ্ধ, সেই তুমিই সুখী, কারণ আনন্দের মাঝেই তুমি আশ্রয় পাবে।"

হায় রে! কতই না কেঁদেছেন, কত কষ্টই না পেয়ে গিয়েছেন উনি! এ ধরণীতে যাদের তিনি ভালবেসেছিলেন, ওখানে গিয়ে তাদের ফিরে পেয়ে তিনি কতই না জানি সুখী আজ! কত দিন তাঁর পরিবারের গল্প করেছেন আমার কাছে। সব ব্যথার, সব দুঃখের কথাই তিনি আমায় একান্তে বলতেন। অত শোক পেয়েও অন্তরে তাঁর বিশ্বাস ছিল অটুট,—প্রিয়জনদের তিনি শীঘ্রই ফিরে পাবেন। হে দেবি, ভগবানের কাছে আমার হয়েও তুমি প্রার্থনা জানাও।

ফেরবার পথে ওক অ্যাভেনিউয়ে দেখা হয়ে গেল জমিদার ও তার ভাইয়ের সঙ্গে। তারা মাছ ধরতে গিয়েছিল। আমায় বাড়ি অবধি দিয়ে গেল।

আমার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যাবে বলে আজ জমিদার আর ওর ভাই এসেছিল। মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দারুণ বৃষ্টি নামল; বাবা তাঁর শিরাবরণ খুলে আমায় দিচ্ছেন দেখে আমি হাসলাম, "আমি বাবা বৃষ্টিকে থোড়াই কেয়ার করি!" বলেই তীরবেগে ছুটিয়ে দিলাম অস্তারলিজকে।

ওঁরাও দৌড়তে শুরু করলেন পেছন পেছন। হাওয়ার বেগ ক্রমেই বাড়ছে, বৃষ্টিও পড়ছে মুষলধারে। মনে হল, হাড় ক'খানা অবধি ভিজে গেল; হাওয়ায় খুলে যাওয়া আমার চুল দিয়ে বড় বড় মুক্তাবিন্দু ঝরে পড়তে লাগল। বাড়ি ফিরে দেখি, মা আমাদের জন্যে অধীর ভাবে পথ চেয়ে আছেন। বৃষ্টি থামল আধ ঘণ্টা বাদে। সূর্য যেই দেখা দিল জমিদাররা উঠে পড়ল।

আজ সন্ধ্যাবেলা জমিদার-গিন্নী এসেছিলেন। জমিদারের জন্মদিন উপলক্ষে তিনি আমার সাহায্য চান। মা সানন্দে সম্মতি দিলেন। ষোল তারিখ বেলা দশটার সময় প্রাসাদে যাব ঠিক হল। সূর্যাস্তের পর ফিরে আসব। আমাদের বুড়ী ঝি তেরেস গল্প করছিল যে গ্রামের স্ত্রী, পুরুষ, শিশু সবাই প্রস্তুত হচ্ছে কুড়ি তারিখের জন্য।

"জমিদার ছেলেটি বড় ভাল," তেরেস বলল, "আমার স্পষ্ট মনে আছে ও যেদিন জন্মাল, ঠিক যেন গত কালের কথা! ওর বাপ ছিলেন অতি সুপুরুষ: নিজে হাতে প্রতি গ্রামবাসীকে উনি নানা উপহার দিয়েছিলেন। আর ছেলের আটকড়াইয়ের দিনে ত স্ত্রী ও নবজাত পুত্র নিয়ে প্রাসাদ-তোরণের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, একে একে প্রত্যেকটি লোককে দর্শন দিয়েছিলেন। সেদিন সবাই এত আনন্দে মেতে উঠেছিল, মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং রাজপুত্রের জন্মোৎসব হচ্ছে। কি জয়ধ্বনির ঘটা! লোকে বলে কিনা এর মধ্যেই কেটে গেছে কুড়িটা বছর। মনে পড়ে, দু-বছর বাদে যুদ্ধে গিয়ে জমিদার মশাই প্রাণ দিলেন। সারা গ্রাম শোকে ভেঙে পড়ল; বাছার তেইশ বছরও হয়েছিল কিনা

সন্দেহ, কিন্তু তারি মধ্যে গ্রামবাসীদের চোখে উনি পিতৃতুল্য শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। তরুণী জমিদার-গিন্নী পড়লেন অসুখে; সবাই ভাবল চললেন বুঝি বৈতরণীর তীরে। কিন্তু না, দুধের বাছা দুটোর মায়া উনি কাটাতে পারলেন না। বেঁচে উঠলেন তাদেরই মুখ চেয়ে। শ্রীমান দ্যুনোয়াকে ত অবিকল ওর বাপের মত দেখতে হয়েছে, সেই রূপ, সেই অভিজাত আদল, সেই কালো চোখ, সেই চুল! আর ছোটটা পেয়েছে তাঁর খোশ মেজাজ! ভগবান এদের মঙ্গল করুন, এই আমার প্রার্থনা, সারা গ্রামবাসীর এই প্রার্থনা।"

তেরেসের বয়স সত্তরের বেশী; আমি তার চোখে একেবারে কচি খুকীটি, কারণ আমার মা পর্যন্ত ওর হাতে মানুষ; ওর স্মৃতির কোঠায় সাজানো দিনগুলি আমায় নিয়ে যায় এক স্বপ্নরাজ্যে। জমিদারের জন্মদিনে এত উৎসব হয়েছিল, তাতে আর আশ্চর্য কি?

পারী থেকে আমার ঠাকুমা জরির কাজ করা একটি নীল ভেল-ভেটের পোশাক পাঠিয়েছেন। সেই সঙ্গে একটা চিঠিও দিয়েছেন।

"স্নেহের নাতনী,

তোর বাবার চিঠিতে জানলাম তোর খবর। চিঠিটা খুলেই চোখে পড়ল—আমার জ্ঞানে যত মেয়ে দেখেছি, তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী—একটি মেয়ের ছবি! প্রথম ঝলকেই তোকে চিনতে পারলাম, যদিও গেল চার বছর তোকে দেখিনি। বহুদিন থেকেই ইচ্ছে আছে, তোকে দেখি; কিন্তু আজ আমি বুড়ো হয়ে গেছি, রেলগাড়ীতে চাপার কথা ভাবতেও শিউরে উঠি। তুই যদি বাপির সঙ্গে পারীতে আসিস, বাপির এই বুড়ী পিসীর সঙ্গে দেখা করতে ভুলিস না কিন্তু। ইতি।—

জেনেভিয়েভ হেনন্ট আর্ভের।"

গোসরেলদের বাড়ি গিয়েছিলাম। শ্রীমতী য়্যোফোনী আমায় তার দুদোয়ারে নিয়ে গিয়ে দেখাল দামী কয়েকটা পাথর; সবে পারী থেকে আনিয়েছে। টেবিলের ওপর একটি যুবকের তৈলচিত্র ছিল;

অদ্ভুত ব্যথাতুর চেহারাটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

"কে এই ভদ্রলোক?" আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম।

"ও আমার খুড়তুত ভাই!" চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস ওর বুক চিরে বেরিয়ে এল। আমার কাঁধে হেলান দিয়ে ও বলল, "বেচারা আমায় ভালবাসত, থাইসিস হয়ে মারা যায় অস্ট্রেলিয়াতে; আমি ওকে বিয়ে করতে রাজী হই নি, কারণ ওর কপর্দকহীনতা; তা ছাড়া আমার পাশে ওকে দেখে লোকে ছোট ভাই বলেই ভুল করত, ভগবানই আমাদের দুজনকে আলাদা ভাবে সৃষ্টি করেছিলেন।"

আরও ছবি ও দেখাল, ওর মার ছবি, ওর স্বর্গত বাবার ছবি। বড় কষ্ট হল ওর কাহিনী শুনে। লেকের ধারে ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে গেলাম আমরা।

লুইয়ের একটা চিঠি এসেছিল; না দেখেই বাবা সেটি পকেটে পুরে ফেললেন।

"কি লিখেছে বাবা, পড় না?" আমি কৌতূহল দমন করতে পারলাম না, "কই তুমি ত আগের মত উৎসাহ নিয়ে ওর চিঠি পড় না আজকাল?"

"কারণ অনেক গোপন কথা ওতে থাকে যা তোর এখন জানার দরকার নেই," মৃদু হেসে আমার গালে উনি টোকা দিলেন।

"লুইয়ের আবার গোপন কি কথা, বাবা? ওর মত সরল ছেলে?"

উনি জবাব দিলেন, "সময় যখন আসবে, ও নিজেই তোকে সব কথা খুলে বলবে মা! যা, অনেক দেরি হল; খাবার আগে একটু জিরিয়ে নে।"

খেতে বসে বাবা কথাটা পাড়লেন: শীঘ্রই লুই আসছে, আঠেরোই তারিখে এসে পৌঁছবে।

"বাঃ, ঠিক উৎসবের আগেই," আমি হাততালি দিয়ে উঠলাম।

"উৎসব? কি উৎসব? ওহো, মনে পড়েছে, জমিদারের জন্মোৎসব!"

বাবা খেই পেলেন।

তুই আবার আসছে, মা খুব খুশী ; সত্যি বলতে কি আমিও কম খুশী নই।

বেশ কিছু দিন হল জমিদার এদিকে আসে নি ; ওর শরীর খারাপ হয় নি ত ? নাঃ, তা হলে জানা যেত। বাবা আর আমি বেড়াচ্ছিলাম ; তাঁকে প্রশ্ন করলাম, স্বর্গত জমিদারের চেহারা তাঁর মনে পড়ে কি না।

"ওঁকে কোন দিন দেখিই নি।"

ততক্ষণে আমরা পাহাড়টায় গিয়ে চড়েছি, "দেখ, মার্গরিৎ, কাকে যেন প্রাসাদে দেখা যাচ্ছে ?"

বহু চেষ্টা করেও কাউকে দেখতে পেলাম না।

"নাঃ, বাবা, চোখে বড় রোদ পড়ছে।"

ঘোড়ার মুখ আমরা ঘুরিয়ে নিলাম।

আজ রবিবার ; গীর্জায় গিয়েছিলাম। বিকেলের উপাসনাতেও আমরা উপস্থিত ছিলাম। যখন বেরিয়ে আসছি জমিদারের সঙ্গে দেখা ; ওকে দেখে শঙ্কামুক্ত হলাম। শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ও এল। চেহারাটা কেমন যেন খারাপ লাগছে ; জিজ্ঞাসা করলাম, "অসুখ করেছিল ?"

"উঁহু, ঠিক অসুখ নয়," ও কথাটা লুফে নিল, "সারা সপ্তাহ দারুণ মাথাটা ধরেছিল। সে কথা থাক, তুমি ষোল তারিখে আসছ, মনে থাকে যেন। তুমি এলে পুরনো প্রাসাদটা যেন প্রাণ ফিরে পায় !"

একসঙ্গেই আমরা বাড়ি অবধি গেলাম।

আজ আমায় জমিদার নিতে এসেছিল, দশটার সময় ; দেখে তাকে বেশ প্রফুল্ল লাগল। ও বলল, এখন ভালই আছে। গাস্তঁও এসেছিল। জানাল, ওদের মামাবাবু ফিরছেন পারী থেকে। বনের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় আমি বড় একটা কথা বলছিলাম না ; আমি যে একমনে শুনতে চাই ওর কথাই ; আমার ভালো-লাগা

প্রসঙ্গগুলোই ও বেছে বেছে আলোচনা করছিল। প্রাসাদে আন্তরিক আশ্লেষ জানালেন কঁতেস্। তাঁর ভাই, করমর্দন। ঘরে ঘরে ফুলের, মালার, পাতার—হাজার জিনিসের সমারোহ। এখুনি আমি ঘর-দোর সাজাতে লেগে যাচ্ছি দেখে জমিদার বাধা দিল।

"শ্রীমতী আর্ভের, আগে একটু বিশ্রাম করে নাও দেখি," ও অনুরোধ করল।

ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের পর আমরা কাজে হাত দিলাম। চারটি ছবি সাজানোর ভার পড়ল আমার ওপর—স্বর্গত জমিদারের, জমিদার-গিন্নীর, বর্তমান জমিদারের ও তার ভাইয়ের। 'ইমর্ত্যাল' আর প্যান্সির একটা করে মালা প্রথম দুটিতে দিয়ে কমলা ফুলের মালা দিয়ে সে দুটি জুড়ে দিলাম। অন্য ছবি দুটিতে দিলাম লাল আর সাদা গোলাপের মালা, লরেল পাতা আর গুটিকয়েক লিলি। জমিদার-গিন্নী আমার রুচির প্রশংসা করলেন। জমিদারের ছবির দিকে তাকিয়ে কর্ণেল বললেন, "ছেলেটা দেখতে একদম বাপকা বেটা।"

"হ্যাঁ," ওঁর বোন জবাব দিলেন, "তবে একটা তফাৎ আছে। চেয়ে দেখ ত ওদের চোখের দিকে,—আমার আশিল্-এর চোখ ছ্যনোয়ার গভীর ব্যথাতুর চোখের চেয়ে কত কমনীয়। তা ছাড়া ছ্যনোয়ার চিবুকে কেমন একটা রুক্ষতার ভাব।"

"আর কেমন পুরুষালি, সুঠাম তাই না?" কর্ণেল জুড়ে দিলেন।

স্বর্গত জমিদারের ছবির তলায় লেখা, "প্লুয়ারভেনের আশিল্ ছ্যনোয়া, বাইশ বছর বয়সে", অন্যটার তলায় লেখা: "প্লয়ারভেনের ছ্যনোয়া শার্ল, কুড়ি বছর বয়সে।"

ভাই-বোনে ছবির বিষয় নানা কথা হচ্ছে, এমন সময় জমিদার এসে ঢুকল।

"তোমার কথাই হচ্ছিল ছ্যনোয়া," ওর মা হেসে বললেন।

"বেশ ত, এমন মিষ্টি সমালোচনায় ভয় পাবার কিছু ত দেখি না।"

ওর মার কোল ঘেঁষে বসল হ্যানোয়া।

গাঁয়ের চাষারা ফুল আর পাতা দিয়ে একটা তোরণ মত করে এনেছে; তলায় গোলাপ দিয়ে লেখা, "তোমার জন্মদিনকে সাদর অভিনন্দন; ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।" জমিদারের প্রতি গ্রাম-বাসীর স্নেহ ও শ্রদ্ধার প্রকাশ এটি। নিজে গিয়ে ওদের ধন্যবাদ দিল জমিদার। কি সমারোহ! হলঘর, খাবার ঘর, আর অন্য দুটি ঘর সাজানো শেষ হল। এর মধ্যে জানেৎকে একদণ্ডের বেশি দেখতে পাই নি। ওকে বেশ সুখী দেখলাম; বেচারা আমার সঙ্গে কথা বলবার ফুরসত মোটেই পাচ্ছে না,—"কারণ হাতে এখন যে কত কাজ রয়েছে," বলেই সে ছুটল রান্নাঘরের দিকে। সন্ধ্যাবেলা জমিদার ও তার মামা আমায় বাড়ি পৌঁছে দিল। তখন চাঁদ উঠেছিল। জমিদার আমায় হাজার হাজার বার ধন্যবাদ জানাল ওর মাকে সাহায্য করতে আসার জন্য। ঝোপগুলি দারুণ ঝলমল করছে, মনে হচ্ছে কেউ যেন ওদের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে রূপোর চাদর। যেতে যেতে দেখলাম আকাশে একটাও তারা চোখে পড়ছে না—এমনই চাঁদের আলো! ছোট্ট নদীটির স্বচ্ছ আয়নার মত জলের ওপর উইলো গাছগুলি ঝুঁকে পড়েছে, যেন নিজেদের ধ্যানেই মগ্ন। পাতায় পাতায় শিহরণ তুলেছে মৃদু বাতাস। সবই সুন্দর! আমরা মুগ্ধচিত্তে এগিয়ে চলেছি। বাড়ি অবধি গিয়ে জমিদার ও তার মামা করমর্দন করে জানালেন শুভরাত্রি।

আজ সকালে লুই এসেছে। বেড়িয়ে যখন ফিরছিলাম, দেখি একজন অশ্বারোহী সৈনিক আমাদের দরজার সামনে থামল।

"ওই ত", বাবা উঠলেন, "লুই এসেছে!"

ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম তীরবেগে।

লুইও এগিয়ে এল। "স্বাগত, লুই, সুস্বাগতম্"! বাবা ঘোড়া থেকে লাফিয়ে ওকে বুকে টেনে নিলেন।

আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে।

"আরে, তুমি ঘোড়ায় চড়তে পার? জানতাম না ত।"

"এই কয়েক সপ্তাহ হল শিখেছি," আমি জানালাম।

"হলে কি হয়," বাবা দুষ্ট গলায় বললেন, "মেয়ে এখন পাকা ঘোড়-সওয়ার বনে গিয়েছে।"

"সে আমি দেখেই বুঝেছি," অস্ত্যারলিজকে আদর করতে করতে লুই জবাব দিল, "চমৎকার ঘোড়াটি কিন্তু!" আমরা বাড়ির ভেতর ঢুকতেই মার সঙ্গে দেখা; লুইকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরলেন।

"তুই এলি বাপ, কি যে শান্তি পেলাম।"

"লুইকে ওর ঘরে নিয়ে গেলেন বাবা। আমি গেলাম আমার ঘরে। খেতে বসে জমিদার-গিন্নীর নেমন্তন্ন-চিঠি মা দিলেন লুইয়ের হাতে। সানন্দে ও রাজী হল। বিকেলের দিকে জমিদার যখন এসে ব্যক্তিগত ভাবে ওকে নেমন্তন্ন জানাল, তখনও লুই অতি আন্তরিক ভাবে তা গ্রহণ করল।

বাবার সঙ্গে লুই আর আমি বেরিয়েছিলাম সকাল আটটায়, ফিরতে এগারোটা বেজে গেল। খাবার একটু আগে, হলঘরে আমি একা ছিলাম; একটি জোরালো পুরুষকণ্ঠে ভেসে এল, ম্যুসের বিখ্যাত কলি,—

"কে মোর প্রেমিক?—আমায় যদি শুধাও তবু
রাজ্য-লোভে বলব না সেই নামটি কভু।"

গান থামলে লুইকে দেখতে পেলাম বাগানে; ওকে গিয়ে বললাম, "কি মঁসিয় লফেভার, আপনি এত ভাল গান জানেন, এত দিন চেপে ছিলেন কেন?"

ও সবিস্ময়ে জবাব দিল, "এই কি আবার গানের ছিরি?"

"একশো বার!

"সত্যি?"

—আমরা খেতে চলে গেলাম। কাল উৎসব।

কি ভাবেই যে আজ সারাটা দিন কাটবে! বাবাকে লুই জিজ্ঞাসা করল প্রাসাদে সামরিক পোশাক পরে যেতে হবে কি না।

"নিশ্চয়ই, তুমি এখন সৈন্যবিভাগের কর্মচারী, আমার বয়সে, অবসর গ্রহণ করে, যা খুশি করতে পার, এখন নয়!"

প্রাতরাশের পরই আমরা রওনা হব, যাতে ওখানে গিয়ে চাষাদের অনুষ্ঠান দেখতে পারি। আজ ওদের মহা ভোজ দেওয়া হবে। এখানেই থামি।

কাল যে কী আমোদেই দিন কেটেছে। গিয়ে দেখলাম চাষা-পাড়ায় সব একে একে জড়ো হচ্ছে। লুই যাওয়াতে কঁতেস অতি প্রীত হয়েছেন। গোসরেলরাও এসেছিল,—ধারে-কাছের কোনও পরিবারই বাদ যায় নি। ঘুরে ঘুরে আমরা সাজ-সজ্জা দেখতে লাগলাম। দুপুর বেলায় চাষাদের জন্য টেবিল পড়ল। ওপর তলায় বারান্দাতে আমরা গিয়ে বসলাম: নিমন্ত্রিতেরা দলে দলে ইতস্তত: ছড়িয়ে আছেন। আমায় সঙ্গে নিয়ে জমিদার প্রজাদের মধ্যে দিয়ে যখন যাচ্ছিল, তখন বলিষ্ঠ এক বুড়ো মাথার টুপি খুলে অভিবাদন জানাল।

"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

জমিদারের দৃঢ় অভিজাত ওষ্ঠের মৃদু হাসি আর দৃষ্টির তীব্র মাধুর্যে একাত্ম হয়ে আমিও বলে উঠলাম, "হ্যাঁ, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।" মাথায় আজ ও টুপি পরে নি; ঢেউ-খেলানো চুলের ওপর দিয়ে চপল হাওয়া খেলে বেড়াচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে সেগুলি উড়িয়ে এনে ফেলছিল ওর হাতীর দাঁতের মত শুভ্র কপালে। ওকে দেখলেই কেমন যেন ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

ওর সুমধুর দরাজ গলা শুনতে যে কি ভাল লাগছিল! এক এক

করে প্রত্যেক চাষার সঙ্গেই ও কথা বলছিল। সব কিছু খুঁটিনাটিতেই ওর সমান আগ্রহ। আমরা ফিরে গেলাম কঁতেস্-এর কাছে।

"তুই যে কি বোকামি করেছিস হ্যনোয়া," তিনি মৃদু তিরস্কার করলেন, "এই রোদে কি টুপি ছাড়া বার হতে আছে? আবার যদি মাথা ধরে?"

আমি ততক্ষণে ওঁর পায়ের কাছে বসেছি; উনি সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। জমিদার কাছেই বসল। কঁতেস-এর হাঁটুর ওপর মাথা রাখলাম আমি।

"সবাই আজ খুব আমোদ করছে তাই না রে হ্যনোয়া?"

"হ্যাঁ মা!"

"বাজল কটা?"

"প্রায় তিনটে।"

"উঃ, সময়ের সঙ্গে আর পেরে উঠছি না বাপু!" আধ ঘণ্টাখানেক বাদে কঁতেস আমায় বললে, "কি মা, তুই যে অনেক কিছু ভাবছিস মনে হচ্ছে?"

আমার ভাব কেটে গেল; সংক্ষেপে জানালাম, "কিছু না।"

"তা হলে প্রায় পনের মিনিট হল তোর মুখে কথা সরছে না কেন?" উনি হেসে ফেললেন।

শ্রীমতী গোস্‌রেল্ এল। কঁতেস্ উঠলেন। আমরা গিয়ে জড়ো হলাম মার কাছে। প্রায় পাঁচটা অবধি খুব ঘোরাঘুরি হল। তার পর খাবার আগে, সবাই একটু বিশ্রাম করে নিল। এর আগে এসে যে-ঘরে ছিলাম, কঁতেস আমায় সেখানেই নিয়ে গেলেন। সময় হলে সবাই গিয়ে জুটলাম বড় হলটায়। ছাদ থেকে শুরু করে চারিদিক সজ্জিত,—সবার চোখ জুড়িয়ে গেল। আমি একটু ব্যবধান রেখেই চলছিলাম,—জানলার ফাঁক দিয়ে চেয়ে ছিলাম বাইরের দিকে। সুন্দর এক প্রশান্তি বয়ে চলে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। তাই একাই ভাল

লাগছিল। হঠাৎ আমার ধ্যানভঙ্গ হল শ্রীমতী গোসরেলের প্রশ্নে, "আচ্ছা, ওই মিলিটারি ভদ্রলোককে চেন ?"

"বাঃ, ও ত কাপ্তেন লফেভার।"—জবাব দিলাম।

"তোমাদের আত্মীয় বুঝি ?"

"উঁহু, পুরনো বন্ধু।"

ইতিমধ্যে লুই এসে পড়ায় তার সঙ্গে গোসরেলের আলাপ করিয়ে দিলাম। আমার কাছেই লুই বসল। গোসরেল ত ওকে পেযে ছাড়তে চায় না। হাঁজার প্রসঙ্গে ও মুখরা হয়ে উঠল। খাবার পর উৎসব-বহ্নি জ্বালানো হল। প্রাসাদে নাচের চলন নেই,—বাঁচলাম! কঁতেস তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর আর কখনও বল্‌-এর ব্যবস্থা করেন নি। শ্রীমতী গোস্‌রেল বেশ ক্ষুণ্ণ হল।

"দূর ছাই, একটু ভাল্‌স্‌ কিংবা কোযাড্রি না হলে মজা কোথায় ?" সখেদে ও আমার কাছে কথাটা পাড়ল।

"সবটাই রুচির ওপর নির্ভর করে ; প্রত্যেকের রুচি স্বতন্ত্র।" আমাব মুখ দিযে কথাটা বেরিয়ে গেল।

"অর্থাৎ, তুমি নাচ ভালবাস না ?"

"বিশেষ না।"

"ওঃ, তুমি তাহলে এলে-বেলে!" এই বলে সে মার্কি দ্য মেরেং-এর সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

রাত এগারোটা অবধি হৈ-হল্লা চলল ; তারপর আমরা বাড়ি ফিরলাম। কি ভাবেই না দিনটা কাটল! প্রজাদের মুখে অনবরত শোনা যাচ্ছে, "জয জমিদারের জয়! জনগণের বন্ধু দীর্ঘজীবী হোন!" কি সুন্দর লাগছিল ওরা যখন দল বেঁধে রাতের অন্ধকারে ফিরছিল মাথার টুপি দোলাতে দোলাতে, জমিদারের জয গাইতে গাইতে। প্রাসাদের দরজা অবধি জমিদার আমাদের পৌঁছে দিতে এল ; আমায় গায়ে একটা পুরু পশমের চাদর জড়িয়ে দিয়ে বলল,—"সাবধান, ঠাণ্ডা

লাগিও না যেন, যা হিম পড়ছে!" অভ্যাস মত কঁতেস আমায় আলিঙ্গন জানালেন। তারপর শুভরাত্রি কামনা করে করমর্দন শুরু হল। কোচ-ম্যান চাবুক হাঁকড়াল; ঘোড়াগুলি রওনা দিল।

রোজকার মত আজও বেড়াতে গিয়েছিলাম। শ্রীমতী গোসরেল ও তার মায়ের সঙ্গে দেখা হল; তাঁরা গাড়ি চড়ে যাচ্ছিলেন প্রতিবেশী কোন্ এক মার্কি-র সঙ্গে দেখা করতে। যত শীগগির পারি আমি যেন ওদের বাড়ি একবার যাই, অনুরোধ করল শ্রীমতী গোসরেল; লুইকেও আমন্ত্রণ জানাতে সে বিনীত ভাবে প্রত্যাখ্যান করল, "যেতে পারলে সত্যিই সুখী হতাম," ও বলল, "কিন্তু হাতে আমার সময় বড় অল্প, আর···"

"বুঝেছি গো বুঝেছি—এই অল্প সময়টুকু নিজের বন্ধুর ওখানেই কাটাতে চান, তাই না মঁসিয় ?" টিটকিরি দিল গোসরেল, "সন্দেহও ছিল মনে—আপনাকে একেবারে ভেড়া বানিয়ে ফেলেছে দেখছি!"

এ কথায় সে বেশ অপমানিত হয়েছে মনে হল; ভ্রূ কুঁচকে আমায় এক ঝলক দেখে নিল। শ্রীমতী গোসরেলও বুঝল লুই অসন্তুষ্ট হয়েছে, তাই বলে উঠল, "নিন কাপ্তেন সাহেব, আর মান করবেন না; আসা চাই; মার্গারিৎ, ওঁকেও সঙ্গে আনিস কিন্তু।"

"কিন্তু," আমি আড়চোখে লুইয়ের দিকে চেয়ে জবাব দিলাম, কারণ এর আগে ওকে কোন দিন রাগতে দেখি নি, "অন্য পক্ষ থেকে যদি আসার চাড় না থাকে ?"

"আহা রে! ভাজা মাছটি উলটে খেতে জান না!" অদম্য কৌতুকে ফেটে পড়ল গোসরেল; তারপর একটু সরস কণ্ঠে বলল, "উনি যদি নেহাৎ আসতে না চান, তুমি একাই এস।"

হেসে হাত নেড়ে সে চলে গেল। লুই আমাদের আগে আগে চলছিল; বাবা আর আমি দ্রুত পদক্ষেপে গিয়ে ওকে ধরে ফেললাম।

"আচ্ছা বাবা, লুই কি রাগ করল ?" আমি তাঁকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

"নাঃ, মনে ত হয় না।"

"কিন্তু শ্রীমতী গোসরেলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ও দারুণ ভ্রূ কুঁচকে উঠল ; এখনও ওর মুখে কঠোরতার ছাপ পরিস্ফুট।"

তিনি হাসলেন ; তারপর ডাকলেন, "লুই।"

কাপ্তেন ঘুরে দাঁড়াল ; তার অকপট সৌম্য মূর্তি আবার ফিরে এসেছে। "কি ব্যাপার ?" সে প্রশ্ন করল।

"মার্গরিতের ধারণা, তুমি রাগ করেছ ; সত্যি নাকি ?"

"হ্যাঁ, খানিক আগে সত্যিই রেগে গিয়েছিলাম ; এই গোসরেল মহিলাটি মাঝে মাঝে বড় রঙ্গপ্রিয় হয়ে ওঠেন দেখছি।"

বিকেলে আমরা সবাই বাগানে বসেছিলাম ; হঠাৎ ছোট্ট হেলেন কোথা থেকে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল। ওকে কোলে তুলে নিয়ে জানতে চাইলাম, কি হয়েছে।

"জান না, আমার ভাই পিয়ের-এব বড অসুখ, চল, তাকে সারিয়ে দিতে হবে।"

ওকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলাম ; ওর হাতে মা বড় এক টুকরো কেক দিলেন, তারপর ও আর আমি পা বাড়ালাম ওদের বাড়ির দিকে ; নিচের ঘরে কাউকে দেখতে পেলাম না।

ফিস-ফিস করে হেলেন বলল, "ওরা সবাই শোবার ঘরে আছে।"

সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম, দরজায় করাঘাত করলাম, সাড়া পেলাম না। আবার ধাক্কা দিলাম, সব শান্ত ; তখন নিজেই দরজা খুলে ঢুকে পড়লাম। চিমনির কাছেই ওদের মা বসে,—কোলে তাঁর রুগ্ন শিশু। জানলার কাছে মঁসিয় ভালপোয়ান ; বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে আছেন তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের দিকে। ক্লদ তার বাবার কোলে মুখ গুঁজে আছে। মঁসিয়

ভালপোয়ান এগিয়ে এলেন আমায় দেখে।

অস্ফুট স্বরে তিনি বললেন, "মাদমোয়াজেল, তুমি এসেছ; দেখ, বাচ্চাটার অবস্থা খুবই খারাপ; ওর মা দারুণ অধৈর্য হয়ে পড়েছেন।"

ওদের মার পাশে গিয়ে আমি বসলাম। কী ভীষণ পাণ্ডুর লাগল ছেলেটাকে—জীবনের কোন চিহ্নই নেই, চোখ দুটি বন্ধ। হাত বাড়িয়ে ওকে আমি নিতে গেলে ভদ্রমহিলা বাধা দিলেন।

"না, না, নিয়ো না গো! বাছা আমার কোলেই থাক, আর কতটুকুই বা থাকবে।" ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তিনি কাঁদতে লাগলেন।

"কয়েক দণ্ড বাদেই আমাদের ছেড়ে জাদু আমার মাটির শীতল গর্ভে আশ্রয় নেবে।"

"না—ভগবান ওকে বাঁচাতে পারবেন।" মৃদু কণ্ঠে আমি প্রতিবাদ করলাম; কেন জানি না, এ কথা শুনে তিনি ওকে আমার কোলে শুইয়ে দিলেন। গরম কাপড়ে ওর গোটা শরীর আমি বেশ করে ঢেকে দিলাম।

বাবাকে বললাম, "মঁসিয় ভালপোয়ান, ডাক্তার ডাকছেন না কেন?" তিনি তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকালেন। বুঝলাম ডাক্তার এসে হতাশ হয়ে চলে গেছেন। তবুও মঁ ভালপোয়ানকে ডাঃ শাঁতোর কাছে আমি পাঠালাম জোর করে। একটু পরেই রোগী চোখ খুলল; আবার তক্ষুনি সভয়ে তা বন্ধ হয়ে গেল; হাত-পা শক্ত হয়ে উঠল। শিশুব্যাধির কোনও প্রতিকারই আমার জানা নেই, তবে মার কাছে শুনেছি যে এ রকম তড়কা হলে গরম জলে স্নান করিয়ে দিলে উপকার পাওয়া যায়। তাই আমি ওকে নাইয়ে দিয়ে ভগবানকে স্মরণ করতে লাগলাম। শুকনো গরম কাপড় দিয়ে বেশ করে ওর গা-হাত-পা মুছিয়ে দিতে ও চোখ খুলে তাকাল; এক ঝিনুক দুধ দিতে ঢোক গিলে খেয়ে নিল।

"ওগো, পিয়ের আমার বেঁচে উঠেছে।" ওর মা চেঁচিয়ে উঠলেন; তখন ওর ছোট্ট দোলনায় ভাল করে ওকে শুইয়ে দিলাম,—পরম আরামে বেচারা ঘুমিয়ে পড়ল। রোগীর মাকেও গিয়ে বিশ্রাম নিতে বললাম;

তিনি রাজী হলেন না। আমরা ডাক্তারের প্রতীক্ষায় রইলাম। ভগবানকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম। খানিক বাদেই সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল, দরজা খুলে ঢুকলেন ডাক্তারবাবু, তাঁর পিছনে মঁ ভালপোয়ান। সব কথা তাঁদের খুলে বলা হল ; মঁসিয়র চোখ দুটি সজল হয়ে উঠল। ডাক্তার এক দাগ ওষুধ দিয়ে বলে গেলেন, রোগীর ঘুমের যেন ব্যাঘাত না হয়, আর জেগে উঠলে ওষুধটা খাইয়ে দিতে। যাবার সময় আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন, "মার্গরিৎ, তুই সত্যি বড় সহৃদয়।" আমার জন্মের বহু আগে থেকেই ইনি আমাদের পরিবারের সঙ্গে পরিচিত।

ছটা নাগাদ লুই আর বাবা এলেন। তখনও পিয়ের ঘুমুচ্ছে। আমি যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম, দেখি, হেলেন লুইয়ের হাত ধরে সবিস্তারে বর্ণনা করছে কি ভাবে পিয়ের "একদম সেরে উঠেছে।" "আমি ঠিক জানতাম উনিই ওকে সারাতে পারবেন," ও বলল, "বড় লক্ষ্মী উনি!"

আমায় দেখে এক ছুট্টে এসে ও আমায় জাপটে ধরল। রোগীর অবস্থার পরিবর্তন দেখে বাবা বেশ সুখী হলেন। হেলেনকে আমি আদর করলাম ; ও লুইয়ের কাছে গিয়ে বলল, "তুমি, তুমি বুঝি আমায় আদর করবে না?"

লুই হেসে ফেলে ওকে কোলে তুলে নিল। আমি গিয়ে বাচ্চাটার পাশে বসলাম ; সত্যিই ও ভাল হয়ে গেছে। সর্বকরুণাময়, তোমারই জয় হোক!

আজ রাতে খাওয়া চুকে গেলে মা আর আমি বৈঠকখানায় বসে-ছিলাম ; কাপ্তেনকে নিয়ে বাবা বাগানে পায়চারি করছিলেন। দুজনেরই মুখে জ্বলন্ত সিগার। কোনও গুরুতর বিষয় নিয়ে তাঁরা আলোচনা করছেন মনে হল ; এ-কথা মাকে বলতে তিনি হেসে বললেন, "যা রে মার্গরিৎ, ওঁদের না ডাকলে চলবে না ; কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

আমি দৌড়ে বাগানে গেলাম। যেতে যেতে বাবার কথা কানে এল, "তোমাদের দুজনেরই বয়স খুব কম,—তবু ওকে একবার বলে দেখ; যদি…"

এমন সময় ওঁর কাঁধে আমি হাত রাখলাম; হঠাৎ তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন।

"আরে তুই, খুকি!" তিনি সবিস্ময়ে বললেন। চাঁদের আলোয় চারিধার অপরূপ লাগছে।—"বাবা, তোমাকে আর কাপ্তেন লফেভারকে ডাকতে এলাম; মা কফি নিয়ে বসে আছেন।" তিনি তাঁর হাতের মুঠো দিয়ে আমার হাতটা ধরলেন।

"আর এক পাক দিয়ে আসি মা! তারপর ফেরা যাবে।" কাপ্তেন ততক্ষণে সিগারটা ফেলে দিয়েছে।

"লুই, ওটা না ফেললেও চলত," বাবা বললেন, "সিগারেটের গন্ধ মার্গরিৎ সহ্য করতে পারে; ও-সবে ও বেশ অভ্যস্ত; বোধ হয় গন্ধটা ওর ভালও লাগে; ওর মতে প্রত্যেক সৈনিকেরই ধূমপান করা উচিত; ও যখন ছোট ছিল, বাপি একদিন এ-কথাই ওকে শিখিয়েছিল; বাপি ত সব সময় লোকের ভালই চায়, না মা?"

"উঁহু, সব সময় কই?" আমি হাসলাম; বুঝলাম ওঁর মাথায় কোনও মতলব জেগেছে, "এই ধর না, যখন বাবা অনর্থক বাইরে থাকেন আর মা একা-একা ঘরে অপেক্ষা করেন কফির পেয়ালা নিয়ে, তখন?"

আমায় মৃদু একটা চড় দিলেন বাবা।

আত্মস্থ ভাবে কাপ্তেন চলছিল আমার পাশে পাশে; তাকে আমি প্রশ্ন করলাম, "তোমার তেষ্টা পায় নি?"

"জান মাদমোয়াজেল," ও উত্তর দিল, "সিগারেট খেলেই বড় তেষ্টা পায়।"

"চল বাবা, আমাদের বড় তেষ্টা পেয়েছে, মঁসিয় লফেভারেরও।"

"আচ্ছা মার্গরিৎ, তুই ওকে মঁসিয় লফেভার বলিস কেন রে ? ও কি তোকে মাদমোয়াজেল আর্ডের বলে ?"

"না, ও আমার নাম ধরেই ডাকে, তাই না ?"—লুই সম্মতিসূচক হাসি হাসল।

"বেশ লুই, আমিও তবে তোমার নাম ধরে ডাকব।" দুজনে আমরা হাতে হাত মেলালাম।

"এবার না গেলে মা কিন্তু রাগ করবেন," আমি বললাম।

মা আমায় কফি পরিবেশনের ভার দিয়েছিলেন ; প্রথম পেয়ালা বাবাকে দিতে তিনি আপত্তি জানালেন, "প্রথমে দিতে হয় অতিথিকে, পাগলী !"

"আমি প্রথমে দিই বয়োজ্যেষ্ঠকে ; তোমার পরে দেব মাকে, তার-পর লুইকে, তারপর নেব আমি।"

"লুই" শুনে সবিস্ময়ে মা আমার দিকে তাকালেন ; বাবার দিকে তাকাতেই তিনি বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়লেন। গতিক সুবিধের নয় দেখে আমি বললাম, "বারে, বাবাই ত আমায় শিখিয়ে দিলেন ওকে নাম ধরে ডাকতে !" বাগানের কথা খুলে বললাম।

"কিন্তু ও তোকে কি সোজাসুজি মার্গরিৎ বলে ?" মা বাধা দিলেন, "ও বলে মাদমোয়াজেল মার্গরিৎ।"

"আমি তা হলে ওকে বলব মঁসিয় লুই কেমন ?"

"না বাপু, আমায় লুই বলেই ডেক।" লুই আপত্তি করল।

"তুমিও তবে আমায় শুধু মার্গরিৎ বলে ডেক ?"

"হ্যাঁ মা—"

—"র্গরিৎ", আমি পূরণ করে দিলাম। লুই লজ্জা পেল ; ও আবার মাদ্‌মোয়াজেল বলতে যাচ্ছিল নির্ঘাৎ।

আজ লুই চলে গেল। সম্ভবতঃ আমিই এর জন্য দায়ী। খুব ভোরে

উঠে টেবিল সাজাব বলে ফুল তুলছিলাম ; সেই সময় লুই এসে হাজির। আমার দুই হাতেই ফুল থাকার দরুন ওর সঙ্গে করমর্দন করতে পারলাম না। আমায় বিব্রত দেখে ওর খুব মজা লাগল।

"এগুলো দিয়ে খাসা একটা তোড়া বানানো যাবে," আমার ফুল-তোলা শেষ হলে ও বলল ; তার পর হাসল, "কই আমার সঙ্গে করমর্দন করলে না, একবার সুপ্রভাত পর্যন্ত বললে না?"

আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম।

ওর নাকের কাছে ফুলগুলো ধরে প্রশ্ন করলাম, "গন্ধ কি চমৎকার, না?"—বহুক্ষণ ও সেগুলির আঘ্রাণ নিল।

"আমায় একটা ফুল দেবে, লক্ষীটি?

"সানন্দে, কি ফুল চাও?"

"একটা মার্গরিৎ ফুল?"

ভাল করে চেয়ে দেখলাম, ও ঠাট্টা করছে কি না ; কিন্তু বেশ গম্ভীর ভাবেই ও এ-অনুরোধটি করল দেখে আমি বললাম, "যাঃ, তুমি বোধ হয় দুষ্টুমি করছ!"

"দুষ্টুমি? মার্গরিৎ, ওই ফুলটি ছাড়া জীবনে আর কিচ্ছুটি চাই না আমি ; এ আমার মনের কথা।"

বৃথাই আমার ফুলের গোছা হাতড়ালাম ওই ফুলটির খোঁজে।

"নাঃ, দেখছি নেই এর মধ্যে ; আচ্ছা, আমি তুলে আনছি, কারণ বাবারও বড় প্রিয় ফুল ওটি ; কাছেই পাওয়া যাবে।"—আমরা গেলাম চেরি-বাগানে ; কয়েকটা মার্গরিৎ ছিঁড়ে তোড়া বানিয়ে ওর হাতে দিলাম, "এই নাও, লুই!"

"পারী শহরের হতভাগী ফুলওয়ালীগুলো পথিকদের অতিষ্ঠ করে তোলে—'ফুল কেন বাবু!'—না কিনলে পিছু ছাড়ে না, তারপর নিজে হাতে সেই ফুল ক্রেতার বুকে গুঁজে দেয়।"—তোড়াটা নিজের বোতামের খাঁজে আটকানোর প্রয়াস করতে করতে লুই কাথটা শোনাল।

"দাও না, আমি এঁটে দিই।"

"সত্যি বড় ভাল হয ; দেখছ ত আমি কেমন অকর্মার ঢেঁকি ?"

তোড়াটা যখন লাগাচ্ছিলাম, ও সকৌতুকে লক্ষ্য করছিল আমায় ; হয়ে গেলে ওর দিকে চেয়ে হাসলাম ; ওর মুখ চিন্তাচ্ছন্ন দেখলাম। হঠাৎ নিচু গলায় আবেগের সঙ্গে ও বলে উঠল।

"মার্গরিৎ, তোমায় বড় ভালবাসি, প্রাণাধিক ভালবাসি তোমায় ; কি বলে প্রকাশ করি সে-প্রেম ? আমার জীবন-সঙ্গিনী হবে মার্গরিৎ, প্রিয়তমা ?"

সভয়ে আমি ওব দিকে তাকালাম ; ওর কথা শেষ হতেই আমি আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না, "ছিঃ, লুই, এমন কথা মুখে এন না ! অসম্ভব !" দারুণ কান্না পেল ; দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেললাম আমি।

ক্ষোভের সঙ্গে ও প্রশ্ন করল, "তুমি কি তবে আমায় ভালবাস না, মার্গরিৎ ?"

"ভালবাসি বই কি, তবে যে আভাস দিলে, সে-ভাবে না।"

"বেশ মার্গরিৎ, আমার দিকে একবার চেযে দেখ ত ?"

আমি চোখ তুললাম। ও ঝুঁকে দাঁড়াল ; উত্তেজনায় ওর সারা মুখ পাংশু হযে উঠেছে।

"মার্গরিৎ, তুমি কি আর কাউকে ভালবাস ?"

আমি নিরুত্তর দেখে ও ধিক্কার দিয়ে উঠল, "ইস্, পদ-মর্য্যাদায় ওর সমান নিজেকে মনে করে কি বোকামিই যে করেছি !"

ও চলে যাচ্ছিল ; আমি একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে ছিলাম। ও বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে আমি ছুটে গেলাম ওর কাছে ; ওর হাত ধরে ফেললাম ; ও দাঁড়াল।

"লুই, লুই, আমায় ক্ষমা কর ! দোহাই তোমার বন্ধু, আমার ওপর রাগ কোর না।"

সহজে ওর মুখে কথা সরল না ; গাছ থেকে শুকনো পাতা একে

একে ঝরে গিয়ে নীরবে উড়ে এসে পড়ছিল আমাদের পায়ের কাছে ; আমার অশ্রুসিক্ত পাণ্ডুর মুখ দেখে ওর বুঝি দয়া হল।

স্নেহার্দ্র কণ্ঠে ও শুধাল, "বল মার্গারিৎ, এখনো বল ?"

"যদি না বলি, আমাদের বন্ধুত্বের এখানেই ইতি, না লুই ?"

—"নির্ঘাৎ ; কিন্তু মার্গারিৎ, আমায় যদি ভালবাসতে, ভেবে দেখ ত, কত সুখী হতাম আমরা ?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলল, "বিদায় মার্গারিৎ, বিদায় !"

"এ কি সত্যই 'বিদায়'—লুই ?"

"আর কোন পথ দেখি না ; কোন দিন আর এ-মুখো হব না, আর কোন দিন দেখা হবে না তোমার সঙ্গে।"

অসীম আবেগে আমরা করমর্দন করলাম ; আমার হাত ওর হাতে নিয়ে আনমনে ও স্বগতোক্তি করল, "প্রাণাধিক প্রিয় হাত দুটি। বিদায় !"

তারপর অকস্মাৎ যেন এক অদম্য শক্তির আজ্ঞায় ওর তপ্ত ওষ্ঠ দুটি নেমে এল আমার হাতের ওপর ! এক মুহূর্ত বাদে ও দেখলাম বাড়ির মধ্যে চলে গেল। আমিও গেলাম, নতজানু হয়ে বসলাম ক্রুশের সামনে ; একান্ত ভাবে আমি প্রার্থনা করলাম, 'ভগবান, আমায় ক্ষমা কর, লুই যেন আমায় ভুলে যেতে পারে, সুখী হোক ও জীবনে।'—দর দর ধারে জল ঝরতে লাগল আমার চোখ বেয়ে।···উঠে দাঁড়ালাম, জানালার ধারে গিয়ে বসলাম। বুড়ো আদলফ আস্তাবলে ঢুকল, লুইয়ের ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে এল। সে কি, লুই চলে যাচ্ছে ! খানিক বাদেই দেখলাম, ওর সঙ্গে বাবা করমর্দন করলেন, পিছনে মা দাঁড়িয়ে। তাঁদের থেকে বিদায় নিয়ে ও ঘোড়ায় চেপে বসল। এত বিষণ্ণ, এত ভগ্নোদ্যম ত ওকে কখনও দেখি নি ? মা ওকে আলিঙ্গন করলেন, আবার করলেন করমর্দন, ও চলে গেল। ক্রমশই ওকে দূরে মিলিয়ে যেতে দেখলাম। অভ্যাস মত এক-বারও ও ফিরে তাকাল না, টুপি নেড়ে জানাল না বিদায়-অভিবাদন।

জানলায় একমনে বসে আছি, মা এলেন, সবই তিনি শুনেছেন। সোফা টেনে আমার পাশে বসলেন। আমি ওঁর বুকে মুখ লুকোলাম।

"মার্গরিৎ, তুই ওকে তাহলে ভালবাসিস, না ?"

"খুবই ভালবাসি মা, তবে অমন ভাবে নয়।"

খানিক চুপ করে থেকে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কাউকে তুই কি ভালবাসিস মা ?"

"হ্যাঁ।"

এত ব্যথার মাঝেও আমার মুখে না জানি হাসি ফুটে উঠেছিল, সেই হাসিটির কথা স্মরণ করে, সগৌরব সেই অভিজাত ওষ্ঠদ্বয়. সেই ঘনশ্যাম শ্যেনদৃষ্টির মাধুর্য, চন্দনশুভ্র বীরত্বব্যঞ্জক সেই কপালের ওপর ঢেউ-খেলানো কেশগুচ্ছের কথা স্মরণ করে।

"বেচারা লুই !" মা নিশ্বাস ফেললেন। "অনেক আশা ছিল, তোদের দুটিকে এক করে দিয়ে যাব। যা হবার হল। ভগবান যা করেন তা মঙ্গলেরই জন্য, মেনে নিলাম এ-কথা।" তিনি আরো বললেন, "যা বাছা, কেঁদে কি হবে ? চোখ তোর লাল টকটক করছে ; যা, চোখ-মুখ ধুয়ে আয়।"

আমায় আদর করে তিনি বেরিয়ে গেলেন। মা গো ! এত বড় অন্যায় করলাম, তবু একটা রূঢ় কথা বার হল না তোমার মুখ দিয়ে ? এ কি পাষাণীর মত ব্যবহার করলাম আমি ? কি বলে আর হাতে আমি এ-জীবন সঁপে দিতে উৎসুক—যে আজ পর্যন্ত মুখ ফুটে কোনও ইঙ্গিত দিল না ? বাবার মুখেও কথা নেই। বড় গম্ভীর লাগল তাঁকে। রাতের বেলা, যখন সবাই গিয়ে বসলাম আগুনের ধারে, তিনি আমার পিঠে হাত রাখলেন। একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন জ্বলন্ত চুলীটার দিকে।

আমার ঘরে গেলাম ; তাকালাম বাইরে, কুয়াশাচ্ছন্ন প্রকৃতির পানে। কে যেন পা টিপে টিপে এসে ঢুকল। তেরেস ; আগুনটা একটু উসকে দিয়ে ও আমার কাছে এল।

"আচ্ছা খুকুদি, অমন সোনার চাঁদ ছেলেটা খামকা চলে গেল কেন রে ?"

"নিশ্চয়ই ওর কাজের সুবিধা হবে বলে !"

"না গো দিদি, আমার মনে হয় তোর ওই কাজল আঁখিই ওর কাল হল !" আমি চুপ করে আছি দেখে ও বলে চলল,—

"শোন্ দিদি, একটা কথা বলি। বাধা দিস্ নে। আমার মনে একটা খটকা লাগে তখুনি, যখন দেখলাম অষ্টপ্রহর ওর চোখ দুটি তোকেই যেন খুঁজে মরছে আঁতিপাতি করে। পোড়াকপালী তুই আর সেদিকে নজর দিলি কই ? আজ সকালে সিঁড়ি পরিষ্কার করছি, দেখি ব্যথাভরা মুখে, চোখ বরাবর টুপি নামিয়ে বেচারা ফিরে এল। নিজের ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিল। আমি ত অবাক! স্পষ্ট শুনলাম, হাউ হাউ করে ও কাঁদছে। দেখ বাছা, সহজ ভালবাসা নয় ওর। পনেরো মিনিট বাদে বেরিয়ে এল, হাতে একটা থলি। আমায় বলল, 'আদিও তেরেস, বিদায় !'—কি যে করুণ হাসি দিদি, বুকটা আমার ছঁাৎ করে উঠল। 'কাপ্তেন সাহেব কি আজই রওনা হবেন নাকি?' আমি জানতে চাইলাম।—'হ্যাঁ তেরেস, বিদায়' !—দেখলাম বাবুর লাইব্রেরিতে গিয়ে ঢুকল।"

তেরেস একটু থামল। জানলার ওপর কনুই রেখে কোন মতে মাথাটা ধরে বসে ছিলাম। বেচারা লুই ! এত গভীর ওর ভালবাসা ! ভগবান ! ভগবান ! আমায় ক্ষমা কর।—হাতে টান পড়ল।

"খুকুদি, রাগ করলি না ত ?"

"না তেরেস !"

একটু দম নিয়ে স্নেহের সুরে ও বলল, "ওকে একটা চিঠি লিখে দে রে দিদি! আসতে লেখ। তোর ওই খুদি হাতের একটা আঁচড় পেলেই ও ছুটে আসবে। ওকে সুখী করা চাই দিদি, লিখবি ত ?"

"উঁহু তেরেস, এখন আর লেখা সম্ভব নয়।"

ও দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"ওর জীবনটা কিন্তু মাঠে মারা গেল। তোকে ও এত ভালবাসে যে প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারে, জানিস ?"

"ছি তেরেস, অমন কথা বলিস না।"—চোখ আমার জলে ভরে উঠল। তবু ধীর গলায় আমি বললাম, "দেখিস, ভগবান ওর অমঙ্গল হতে দেবেন না। সব কিছু তিনিই ত চালাচ্ছেন। তিনিই কি আমাদের সব বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করছেন না ? আমাদের জন্য তিনি কি সদাজাগ্রত নন ?"

'বেশ খুকুদি, তুই যা করিস তা কখনও কারও ক্ষতি করে নি। শুভরাত্রি ; দেবদূতেরা তোর মঙ্গল করুন।"

ও বেরিয়ে গেল।

হাওয়া ঠাণ্ডা হযে উঠল। মলিন হয়ে উঠল তারাগুলো ; আমি জানলাটা ভেজিয়ে দিলাম , সত্যিই কি আমার সামনে সুখের পেযালা তুলে ধরা হয়েছিল, আর তা আমি প্রত্যাখ্যান করলাম ?—না, না, অসম্ভব !—কি করে আমি তার ঘরে গিয়ে সুখী হতাম, যাকে আশানুরূপ ভালবাসতে পারলাম না ? ভালবাসি ওকে বন্ধুরূপে, ঘনিষ্ঠ বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে। তার বেশী না। আমার যা কর্তব্য আমি করেছি বলেই মনে হয়।—আবার জানলা খুলে দিতেই হাড়-কাঁপানো হাওয়া ঢুকে মজ্জা অবধি কাঁপিয়ে দিল। অব্যক্ত এক ব্যথার প্রভাবে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। এঁটে দিলাম জানলাটা ক্রুশের তলায হাঁটু গেড়ে বসলাম, "ভগবান, আমায় পরিত্যাগ কোর না, ত্যাগ কোর না আমায়।" বহুক্ষণ ওই ভাবে বসে রইলাম। যে ব্যাপারটা ঘটে গেল তারই চার ধারে আমার চিন্তারাশি জমা হয়ে উঠল। আমাদের সবার শুভ কামনা করলাম ; লুইয়ের জন্য প্রার্থনা করলাম, আর প্রার্থনা করলাম আমার প্রেমাস্পদের জন্য। রাত বারোটার ঘণ্টা বাজল ; শুতে যাই।

কাল বৈঠকখানায় জানলার ধারে বসেছিলাম; কিসের চিন্তায় মশগুল ছিলাম জানি না, হঠাৎ মনে হল জমিদার আমার সামনে দিয়ে চলে গেল; ও এখানেই আসছে কি না, সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময় ওর পায়ের শব্দ শোনা গেল সিঁড়ির ওপর। বাবা দরজা খুলে ওকে ভেতরে নিয়ে এলেন। মোমবাতি জ্বালা হয় নি; চিমনির ম্লান আলো ছাড়া ঘর প্রায় অন্ধকার (যা ঠাণ্ডা পড়েছে, আগুন আজকাল রোজই জ্বালতে হয়)। বাবা ঘণ্টা বাজালেন; বুড়ো আদলফ বড় বড় বাতি নিয়ে এল; জমিদার আমার সঙ্গে করমর্দন করল।

"শ্রীমতী আর্ভের, বড় দুর্বল দেখছি তোমায়; শরীর খারাপ হয় নি তো?"

"উঁহু," আমি জবাব দিলাম। আমার গাল দুটো বোধ করি লাল হয়ে উঠল, যা দেখে জমিদার বলল, "যাক, এবার আশ্বস্ত হলাম সত্যি!"

আগুনের পাশে বসে গল্প শুরু হল। লুইয়ের খবর জানতে চাইল ও। ক্রমেই আমি চুপ করে যাচ্ছি, এক মনে শুনছি ওর আলোচনা বাবার সঙ্গে: রাজনীতি, ভূতত্ত্বের সাম্প্রতিক আবিষ্কার, সাহিত্য—কত বিষয়েই যে কথা হচ্ছিল। এত জিনিস ও শিখল কোথায়?—আমায় ও গান গাইতে অনুরোধ করল। তারপর কি খেয়াল হল, নিজে গিয়ে বসল পিয়ানোর সামনে; বাজাতে শুরু করল অপূর্ব কয়েকটি সঙ্গত। বিখ্যাত 'লা ত্রাভিয়াতা'র গানটি ভেসে এল,

"Di Provenza ilmar il Suol"

দরাজ গলা গম গম করতে লাগল ছোট্ট ঘরটিতে; প্রথম স্তবকের শেষ লাইন কটি ধ্বনিত হতে থাকল দূর থেকে দূরান্তরে:

"Dio mi...gui—da...Dio mi guida!"

(ভগবান, আমায় পথ দেখাও, আমায় পথ দেখাও!)

তারপর অতি মধুর, অতি হৃদয়গ্রাহী স্বরে ও শুরু করল,

"Ah !—Il tuo...vecchio ge-ni-tor···
tu non sai quanto soffri...
Tu non sai quanto soffri."

(হায় পরম পিতা, জান না মোর কত যাতনা, কত যাতনা !)

* * *

নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে শিউরে উঠছিলাম। লুইযের কথা স্মরণে এল ; প্রত্যাখ্যাত তার চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। শত চেষ্টাতেও অশ্রু সংবরণ করা ভার হল। জানলার আড়ালে বসে আমি চোখ মুছে ফেললাম। গান শেষ করে জমিদার উঠে এল আমার কাছে।

"বাঃ, দ্যুনোয়া, অপূর্ব তোমার গলা।" বাবা তারিফ করলেন, "গ্রিসি নিজেও এমন প্রাণ দিযে, এত দরদ ঢেলে গাইতে পারতেন কি না সন্দেহ !"

ও হাসল, "না জেনারেল, নেহাৎ স্নেহের খাতিরে এ-কথা বলছেন আপনি। শ্রীমতী মার্গরিতের গান শুনতে আপনি নিত্য অভ্যস্ত। আপনার মুখে এ কথা সাজে না।"

পিয়ানোর সামনে বসবার জন্য ও আমায় পীড়াপীড়ি করতে লাগল। ওর কাছে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিলাম—আজ গান গাইতে পারব না। তারপর বাজাতে শুরু করলাম ভ্যাবর (Veber)-এর শেষ ভাল্‌স্‌টি। বাজানো শেষ হতে না হতে জমিদার বলে উঠল, "এত করুণ, এত মর্মান্তিক বাজনা জীবনে শুনি নি ; মুমূর্ষু মরালের গানের মত, প্রেম-মুগ্ধদের বিদায়-সম্ভাষণের মতই নিদারুণ এর মূর্ছনা !"

আমার পাশে বসে ও কঁতেস-এর প্রসঙ্গ তুলল, "মা হরদম তোমার কথাই বলছেন ; কেনই বা বলবেন না,—তোমার মত মহানুভব বড় একটা চোখে পড়ে না, আর যাদের অন্তরাত্মা নিষ্কলুষ, তারাই তো পরস্পরকে ভালবাসে, তাই না ?"

"তাঁরাই পরস্পরকে ভালবাসেন সত্যি, কিন্তু আমি তো ভাল নই মোটেই ; তোমার মার কথা আলাদা—তাঁর চরিত্র তো দেবতুল্য।"

ওর সঙ্গে কথা বলা, ওর সান্নিধ্যে দু'দণ্ড বসা, ওর আয়ত দুটি চোখ প্রাণ ভরে দেখা, ওর সঙ্গে তাল রেখে একই নিশ্বাস বুক ভরে নেওয়া, এর বড় সুখ আমি চাই না ; আমার সব ব্যথা ধুয়ে-মুছে কোথায় উধাও হয়ে গেল।

"তোমার ভাইয়ের আর দেখা পাই না কেন ?"

ওর কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

"তার শরীর ভাল আছে ত ?"

"না না," জমিদার হেসে উঠল, "গাস্তঁর স্বাস্থ্য চিরকালই ভাল ; আমার মত যখন-তখন ওকে ভুগতে হয় না।"

ওর মার হয়ে আমায় জমিদার বলে গেল, কিছুদিনের জন্য যেন প্রাসাদে যাই আবার। মা ওকে কথা দিলেন যে আমি যাব ; আমাকেও ইঙ্গিত দিলেন যে এ-অবস্থায় আমার পক্ষে ওখানে গেলে ভালই হবে। কথা ঠিক করলেন ওঁরা,—দশ তারিখে ওখানে যাব।

ভাল্‌পোয়ানদের বাড়ি গিয়েছিলাম আজ। ওদের ঘরে কেউ নেই দেখে চলে আসছি, এমন সময় হেলেন দৌড়োতে দৌড়োতে বাগান থেকে বেরিয়ে এল। আমায় খুব বড় একটা 'হামি' দিয়ে ও আমার পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে যা খুঁজছিল, পেয়ে গেল। আমার দেওয়া মিষ্টিতে কামড় মেরে শুরু করল ও বক্‌বক্‌ করতে।

"আচ্ছা হেলেন, উৎসবের দিন প্রাসাদে খুব মজা করলি না ?"

"খুব মজা ; জমিদার আমায় কোলে তুলে আদর করেছিল, জান ? আর আমায় এত্ত বড় একটা কেক দিয়েছিল," বড় একটা ফুলকপি দেখাল ও।

"বাঃ, জমিদার তাহলে খুব লক্ষ্মী বলতে হবে ?"

"ছাই লক্ষ্মী," গলাটা নিচু করে, চারিদিকে তাকিয়ে ও বলল, "কক্‌খনো আর ওকে 'হামি' খাব না—রাজ্যের লাজেঞ্চুস দিলেও না।"

"কেন হেলেন, কেন রে?"

"ও খুব খারাপ লোক।"

"ছিঃ হেলেন, অমন কথা বলতে নেই। ও-সব বাজে কথা।"

"কে বলল বাজে কথা? সব সত্যি; জান, মা সেদিন বাবাকে এ-কথা বলছিলেন।"

"শোন হেলেন, জমিদার অতি ভাল লোক; সবাইকে ও কত ভালবাসে; তোকে ত কত বার পয়সা দিয়েছে, খেলনা দিয়েছে!"

"হ্যাঁ, আমিও মাকে তা বললাম; তিনি মাথা নাড়লেন; আমায টেনে নিয়ে গিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন!—আচ্ছা এই লজেঞ্চুসগুলোব একভাগ কি ক্লদের জন্যে রাখতে হবে?"

"হ্যাঁ।"

এ আমি কি শুনলাম? বড় রাগ হল। এত মহৎ, এত পরোপকাবী, তবু লোকে এর নিন্দা করে? বিশেষতঃ মাদাম ভাল্‌পোযান্ কি অকৃতজ্ঞ! এদের জন্য, স্কুলের জন্য কী না করেছে জমিদার! নাঃ, মাদাম ভালপোযানকে অন্য প্রকৃতির লোক বলে জানতাম।—চমক ভাঙল হেলেনের ডাকে।

"এর থেকে আর একটা লজেঞ্চুস নিই?"

"সব ক'টা খেযে ফেল, এগুলো তোরই সব।"

ক্লদের নাম করে, আর এক প্যাকেট ওর হাতে দিয়ে আমি চলে এলাম তাড়াতাড়ি। বাড়ি ঢুকতেই বাবার সঙ্গে দেখা।

"কি হল রে মার্গারিৎ? বড় চিন্তাকুল দেখছি তোকে?"

ওকে আমি ঘটনাটা খুলে জানালাম।

"তাই বলে তুই মাদামের সঙ্গে দেখা না করেই চলে এলি?"

"দেখা করব কি? যা রাগ হচ্ছে!"

বাবা হাসলেন।

"কি আশ্চর্য! কোন দিন শুনলে বিশ্বাসই করতে পারতেম না যে তুই রাগতে পারিস।" বলে উনি আমায় আদর করলেন।

"মার্গরিৎ, লুইয়ের চিঠি এসেছে।"

"ভাল আছে?

"হ্যাঁ, তবে বড় আঘাত পেয়েছে।"

"বেচারা!"

আমার চোখ জলে ভরে গেল। অবাক হয়ে বাবা আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তার পর একটু দম নিয়ে বললেন, "এমন কিছু নয় মা; সয়ে যাবে।" বলে হাসলেন, "কিংবা হয়ত তোর মতের পরিবর্তন হবে।"

আমি গোমড়া মেরে আছি দেখে উনি কথার মোড ঘোরালেন, "চল্, সবই ভগবানের ইচ্ছা!"

কাল আমরা পারী যাচ্ছি। বেশ কিছুদিন হল বাবা-মা তোড়জোড় করছিলেন—আমায় বিন্দুমাত্র জানতে দেন নি। আজ সকালে বাবা যখন আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "যা খুকী, গোছগাছ করে নে; কাল ভোরে আমরা পারী যাচ্ছি!"—আমি ত আকাশ থেকে পড়লাম, কোথায় যেন বোমা ফাটল। বাবা আনন্দে আটখানা, "কেমন জব্দ? হল ত?"

আমার সন্দেহ ঘোচে নি তখনও, "সত্যি বলছ, বাবা?"

"তা নয়ত বলছি কেন?"

ঘরে গেলাম; মাল পত্তর বাঁধা ছাঁদা শুরু করলাম। কবে ফিরছি জানি না; কয়েক দিনের মধ্যে ফিরতে পারলেই ভাল হয়। জীবনে পারী দেখি নি। লুইয়ের মুখে কত কথাই না শুনেছি। আর ঠাকুমা! ওঁকে নিশ্চয়ই দেখতে যাব।

বাইরের দিকে তাকালাম। সব কিছুই বিষণ্ণ, ম্লান। গাছ থেকে পাতার রাশি ঝরে গিয়েছে, সূর্য চলে গিয়েছে পশ্চিমে, ফিকে হয়ে এসেছে অস্তরাগ। জমিদার ঘোড়ায় চড়ে আসছে, সঙ্গে ওর ভাই। ওই ত, আমায় দেখতে পেয়েছে! হাত নাড়ল, হাসল। ও বোধ হয় জানে না, কাল আমরা চলে যাচ্ছি। তা হলে এসে দেখা করে যেত। কোন্ প্রাণে যে লোকে ওর নামে কলঙ্ক রটায়। ও এমনই দয়ালু, একটা মাছি মারবতে পর্যন্ত হাত সরবে কি না সন্দেহ। কি এমন করেছে, যার ফলে ওর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ? এত কোমল ওর অন্তঃকরণ!—অবশ্য কঠোর হতেও ও জানে। নিজের কাজ করে যায় এক মনে, অবিচল ভাবে; লোকের কথায় ভ্রুক্ষেপ করে না। ক্রমেই দৃশ্যের বাইরে মিলিয়ে যাচ্ছে ওর ঘোড়া; গাস্তঁ তার ঘোড়ার বেগ বাড়িয়ে দিল; হ্যনোয়া থামল এক দণ্ড, তার পর কদম চালে এগিয়ে গেল। ভগবান ওকে রক্ষা করুন।

পারীতে এসে গেছি। ঠাকুমার এখানে উঠেছি। অকপট আদরে তিনি আমাদের টেনে নিয়েছেন নিজের কোলে। বাবা আর মাকে আলিঙ্গন করে, আমায় দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন তিনি।

"কি সুন্দরী, তুই-ই আমার মার্গারিৎ?" উনি আনন্দে অধীর হযে উঠলেন, "কি ডাগরটাই না হয়েছিস, কি রূপ যে খুলেছে দিদি! পারী শহরের ছোঁড়াগুলো প্রথম দর্শনেই কাৎ হবে দেখছি।"

আমার কান গরম হয়ে উঠল। ঠাকুমা বাবার দিকে তাকালেন; ইঙ্গিতে কি কথা হল। বাবা আমায ওপরে যেতে বললেন। উনি, মা আর ঠাকুমা খানিক বাদে এলেন। ঠাকুমা আমাদের আর কোথাও থাকতে দেবেন না; এখান থেকে এক পা যদি বাড়াই আমরা, উনি মাথা খুঁড়ে মরবেন। সারা দিন আমরা লুভর-এর জাদুঘর দেখে কাটালাম। বিকেলের দিকে বাবা মা পুরনো এক বন্ধুর বাড়ি গেলেন।

ঠাকুমার কাছেই রইলাম আমি। সমবয়সী বন্ধুর মত উনি আমার সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন।

"আচ্ছা দিদি, এর আগে বুঝি তুই এ-মুখো হস নি?"

"না ঠাকুমা, বাড়ির বাইরে, গাঁয়ের বাইরেই বিশেষ যাই নি।'

আগুনটায় কিছু কাঠ দিয়ে উনি আমায় চিমনির দিকে সরে বসতে বললেন।

"আচ্ছা, ব্রতাঁইয়ের কাকে কাকে চিনিস রে? মুয়ারভেনদের জানিস না কি?"

"হ্যাঁ।"

"কঁতেস ত বিধবা; দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘর—"

"না, ওঁর মেয়ে নেই; দুটিই ছেলে।"

"সে-দুটো এত দিনে বোধ হয় দারুণ লায়েক হয়ে উঠেছে। বড়টার নাম কি যেন? দ্যুনোয়া?"

"হ্যাঁ ঠাকুমা, আপনি ওদের চেনেন দেখছি।"

"চিনব না?—তোদের ওখানে ওরা আসে যায়, ছেলেগুলো?"

"হ্যাঁ! কঁতেস আমায় বড় স্নেহ করেন। বড় ভালবাসেন। প্রায়ই আমায় ওঁর ওখানে গিয়ে থাকতে বলেন। গত মাসে, জমিদারের জন্মদিনে কি উৎসবটাই যে হল!

"কার বললি? বড় ছেলেটার?"

"হুঁ।"

"দ্যুনোয়া তোদের ওখানে যায়?"

"প্রায়ই ত যায়।

"রোজ?"

আমি হাসি চাপতে পারলাম না, "রোজ কি করে আসবে, ঠাকুমা? ওর যা কাজের চাপ!"

"তোকে নাকি ওর বড় মনে ধরেছে?" ঠাকুমার মুখে-চোখে চাপা

কৌতুক ছড়ানো।

জড়িত কণ্ঠে জবাব দিলাম, "কই, জানি না ত!"

উনি হো-হো করে হেসে উঠলেন, "তাতে কি? তোর বুড়ী ঠাকুমার মন মজেছে তোর রূপে; আর কি চাই?"

উনি আমায় একটা ছবির এলবাম দেখালেন। তাতে লুইয়ের ছবিও চোখে পড়ল।

"এটা ত কাপ্তেন লফেভার-এর ছবি, তাই না?"

"হ্যাঁ, চিনিস দেখছি ওকে।"

"বাঃ, চিনি না? এই ত সেদিন ও আমাদের ওখানে এসেছিল!"

"আমার এখানেও যখন-তখন ও আসত; গেল দুই মাস কিন্তু ওর পাত্তা পাই নি।"

দশটা বাজল; ঠাকুমা আমায় শুতে যেতে বললেন। ইচ্ছে ছিল, বাবা মার জন্য অপেক্ষা করি। ঠাকুমা কিন্তু মানা করলেন, "তবে যে এই গোলাপগুলো শুকিয়ে যাবে।" আমার গাল টিপে উনি বললেন, "এত রাত করে কি শুতে হয়?" আমায় তিনতলার ঘরে নিয়ে গেলেন। শোবার ঘর, বুদোয়ার—দুটিই ভারি সুন্দর সাজানো। আমায় আলিঙ্গন জানিয়ে ঠাকুমা চলে গেলেন। চিমনিতে গনগনে আগুন। পরনের পোশাক খুলে ফেললাম। ড্রেসিং-গাউন মুড়ি দিয়ে খাটের ওপর বসলাম হাঁটু গেড়ে। তারপর শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

বাবা কাল চিত্রকর মঁসিয় রেন্যরকে এনেছিলেন। আমার ছবি আঁকাবেন। ভদ্রলোক শুধু একটা স্কেচ করে নিয়ে গেলেন। ওর থেকে তৈরি হবে তৈলচিত্র।—সাত তারিখের পর আমরা দেশে যাব। বাবার বহু বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা হল।

আজ আবার মঁসিয় রেন্যর এসেছিলেন। পাকা হাত ভদ্রলোকের। ছবিটা যে বিশেষ ধরনের হবে, আঁচ করা যাচ্ছে। সবে চার দিন হল

এসেছি ; এর মধ্যেই ফেরার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছি। আজ সন্ধ্যাবেলা জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিলাম ; হঠাৎ দেখি, পাশে ঠাকুমা।

"আহা, দিদি রে, কার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ছিলি রে ?"

চাকরটা এখনো বাতি জ্বেলে যায় নি, তাই রক্ষে ; হঠাৎ গাল দুটো আমার যেন লাল হয়ে উঠল ; নাঃ, ঠাকুমা বড় পেছনে লাগেন দেখছি।

আমরা ফিরে এসেছি। বিকেল পাঁচটার ট্রেনে এলাম। খাবার পর একটু জিরিয়ে নিলাম আমার ঘরে গিয়ে। পরশু আমি প্রাসাদে যাব। ও (জমিদার আর কি) নিশ্চয়ই জানে না আমরা ফিরে এসেছি। তা হলে কি একবার আসত না ? কিংবা, হয়ত ওর শরীর ভাল নেই। নাঃ, কি যে আমার আজে-বাজে ভাবনা ! কাল ও নির্ঘাৎ আসবে। এবার শুয়ে পড়ি।

পরদিনও ও এল না ; কি ব্যাপার ? বড় ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে। সারাটা সকাল বৃষ্টি পড়ছে। বেড়াতে যেতে পারি নি। বাবা আর আমি মোলিয়্যার পড়তে বসলাম। বাবা ত বুর্জোয়া জাঁতিওমের দুরবস্থায় হেসে খুন ! আমার কিছুই ছাই ভাল লাগছে না।

"কি হল রে খুকী ? এত গোমড়া মেরে গেলি যে ?"

"জানি না বাবা, আজ কিছুতেই আনন্দ পাচ্ছি না যেন।"

বিকেল ৩টে নাগাদ বৃষ্টি থেমে এল। বাবার সঙ্গে ঘোড়া নিয়ে বার হলাম। দেখা হল জমিদারের সঙ্গে। আমাদের অভিবাদন জানিয়ে ও সঙ্গে সঙ্গেই চলল ; ওর চেহারাটা কেমন যেন খারাপ লাগল। বেচারা জানতই না, আমরা পারী গিয়েছিলাম। কাল ও আমায় নিয়ে যাবে প্রাসাদে। চারটে অবধি ঘোরা গেল। মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্য দেখা যাচ্ছে ; বাবা জমিদারকে পারীর গল্প করছিলেন ; ওর মন কিন্তু যেন অন্যত্র রয়েছে। নদীর ধার অবধি এসে ও বিদায় নিল। হয় ওর শরীর খারাপ, নয়ত অন্য কিছুর চিন্তায় ও মগ্ন হয়ে রয়েছে। বাবার সময় কই

রীতি-মাফিক আমাদের দিকে একবার তাকালও না, মাথার টুপি খুলে বিদায়ও জানাল না।

ও আর ওর মা গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। মেঘে-সূর্যে লড়াই চলেছে; ভীষণ শীত আজ; পরম স্নেহে কঁতেস আমায় গাড়িতে তুলে নিয়ে নিজের পাশে বসালেন। জমিদার বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে মনে হল। মার আদেশে গাড়িতেই ওকে উঠতে হল। আমায় আর কঁতেসকে চাদর দিয়ে ভাল ভাবে ঢেকে দিয়ে ও খড়খড়ি এঁটে দিল। সবেগে গাড়ি ছুটে চলল জনহীন মাঠের বুক চিরে। আমরা প্রাসাদের বৈঠকখানায় পৌঁছে বহু বিষয়ে আলোচনা করলাম। গাস্ত' বাড়ি নেই। আমার ঘরে গিয়ে টুপি গরম জামা বিছানায় রেখে গেলাম জানলার ধারে। চারিধার নির্জন। বাইরে হাওয়ার আর্তনাদ। পাতা-ঝরে-যাওয়া নগ্ন ডালগুলোতে লেগেছে বিশ্রী রকম হুটোপুটি। এই বিষণ্ণ দৃশ্য আর সহ্য হল না; আগুনের ধারে গিয়ে বসলাম। নিচে যাবার সময় সিঁড়িতে জমিদারের সঙ্গে দেখা।

"আজও বাইরে যাওয়া অসম্ভব; চল, প্রাসাদের অদেখা যা কিছু তোমায় দেখিয়ে আনি।"

আমি সোৎসাহে রাজী হলাম।

বড় বন্ধ ঘরটা খুলে ও প্রথমে দেখাল পুরনো বই আর ছবির রাশি। ঘরে চারটে মাত্র জানলা: কেমন ছমছমে ভাব।

"এই দেখ সেই ক্যাথেরিনের ছবি—প্রেমের বেদীতে যিনি বিসর্জন দিয়েছিলেন আপন জীবন;—এই তাঁর ভাই, সেই যোদ্ধার ছবি!"

একে একে প্রতিটি ছবির ইতিবৃত্ত শোনা গেল।

"প্রাসাদের সুড়ঙ্গ দেখবে?"

"চল না।"

"ভয় করবে না?"

"কিসের ভয় ?"

"দারুণ অন্ধকার ওখানে ; তা ছাড়া শোনা যায় যে ৯০৯ খ্রীস্টাব্দে নাকি জমিদার আর্তুর স্থ প্লুয়ারভেন ওখানে নরহত্যা করেছিলেন। এখনও মেঝেতে রক্তের দাগ আছে।"

"থাক্ না, তুমি আছ, আমার ভয় কি ?"

এতক্ষণ ওর কপালে একটা জটিল রেখা দেখা যাচ্ছিল। আমার উত্তরে ও তৃপ্ত হল। ছোট্ট একটা গুপ্ত দরজা খুলে ও আমার হাত ধরে সন্তর্পণে অগ্রসর হল সুড়ঙ্গপথে। জালে-ঢাকা ছোট্ট একটা ঘুলঘুলি দিয়ে এক ছিলকে আলো এসে কেমন বিদঘুটে পরিবেশ গড়ে তুলেছে। অতি দীর্ঘ সুড়ঙ্গটি। পথ যেন শেষ হয় না। অন্ধকার ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে। কিন্তু ও আমার হাত ধরে আছে, তাই ভয় করছে না একদম। প্রায় পনেরো মিনিট হাঁটার পর অতি নিচু সঙ্কীর্ণ একটা দরজা দেখা গেল। খোলামাত্র সামনে পড়ল ধু-ধু মাঠ। বৃষ্টি থেমে গেছে ; একটা স্প্রিং দিয়ে জমিদার দরজাটা এঁটে দিল।

"উঃ, ওখান থেকে বেরিয়ে বুক ভরে নিশ্বাস নেবার যে কী সুখ !" ও বলল।

হাওয়া অবিরাম গর্জে চলেছে। তাড়াতাড়ি আমরা পা বাড়ালাম প্রাসাদের দিকে। মঁসিয় রেকামিয়ে—গাঁয়ের পাদরী, আজ এখানেই খেলেন। অতি সৎ চরিত্রের লোক ; বড় দয়ালু। জমিদার ও তার ভাইয়ের শিক্ষক ছিলেন উনি,—নিজের সন্তানের মত ওদের ভালবাসেন।

রাত্রে চিমনির সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম সারা দিনের কথা। কে যেন দরজায় টোকা দিল ; কঁতেস এলেন। আমার পাশে বসে টেনে নিলেন আমায় তাঁর কাছে। ওঁর কাঁধে মাথা রাখলাম। কী স্নেহার্দ্র, গভীর ওঁর স্পর্শ !

"কি ভাবছিলি মা ? মনে হল কি-এক স্বপ্নে তুই ডুবেছিলি ; স্পষ্ট তার প্রকাশ দেখলাম তোর রসাপ্লুত মুখে।"

উত্তরে ওঁর হাতে আলতোভাবে চুমু দিলাম। উনি যে ওরই গর্ভধারিণী ; এই পৃথিবীতে উনিই ত ওকে এনেছেন, মানুষ করেছেন নিজের বুকের রক্ত দিয়ে। ওঁর প্রতি অব্যক্ত এক কৃতজ্ঞতায় আমার অন্তর ভরে উঠল।

"বুঝলি, রোজ শোবার আগে আমার ঘুমন্ত ছেলেদের একবার দেখে যাওয়া আমার অভ্যাস ; যখন ওরা এতটুকু ছিল, তখন থেকেই এভাবে দেখে আসছি ; আজও দেখি। তোকেও দেখতে এলাম। তোকে যে আমি নিজের মেয়ের মতই ভালবাসি। ত্যুনোয়া, গাস্তঁর মত তুইও আমায় ভালবাসিস ; না মা ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাকে সত্যি বড় আপন মনে হয়। আচ্ছা গেল সপ্তাহে কি জমিদারের শরীর খারাপ হয়েছিল ?"

"বিশেষ কিছু না ; কিন্তু, তুই ওকে 'জমিদার' বলে ডাকিস কেন মা ? শুধু ত্যুনোয়া বলে ডাকলেই পারিস। চার বছর বয়সে তুই যে ওকে নাম ধরেই ডাকতিস।" আমি দ্বিধান্বিতা দেখে উনি হাসলেন।

"যা মা, ঘুমিয়ে পড় ; তোর ভাল ঘুম হোক, এই প্রার্থনা করি।"

উনি চলে গেলেন। আমি খাটের পাশে বসে প্রার্থনা করলাম। পরম পিতার চরণে প্রার্থনা করলাম, আমাদের যেন অযথা প্রলোভন থেকে তিনি দূরে রাখেন। শোবার আগে মশারিটা একটু ফাঁক করে চেয়ে দেখলাম—দারুণ আঁধারে আর কুয়াশায় আচ্ছন্ন সমস্ত পৃথিবী। জানালায় জানালায় জেগেছে হাওয়ার কান্না। আকাশে ছড়ানো অযুত তারার বীজ। কি অপরূপ! "আকাশের বুকে ভগবানের কীর্তি প্রকট, আর সারা বিশ্বের বুকে প্রকট তাঁর সৃজনী চিহ্ন।" কি সত্য! তারা-ভরা আকাশের দিকে চেয়ে এ কথাই বার বার মনে আসে। আমি শুয়ে পড়লাম। সমস্ত প্রাসাদ নিদ্রামগ্ন।

কাল রাতে বছরের প্রথম তুষারপাত। সকালে উঠেই চোখে পড়ল

জানলার ওপারে সব কিছু ধবধব করছে সাদা। কি অপূর্ব শুভ্রতা! সন্ন্যাসিনীর মত সাদা পোশাকে পৃথিবী আজ সেজেছে; যা কিছু অপরিচ্ছন্ন, কালিমাময়,—তা আজ উজ্জ্বল এই পবিত্রতার মাঝে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জানেৎ এল আগুন নিয়ে।

"বঁজুর মাদমোযাজেল; কি ঠাণ্ডা পড়েছে দেখছেন! আপনি ত বেশ সকাল সকাল উঠে পড়েছেন!"

"সে কি জানেৎ, তুই বলছিস সকাল সকাল? তুই তা হলে কোন্ ভোরে উঠেছিস না জানি!"

ও হেসে চলে গেল। আটটা নাগাদ গেলাম বৈঠকখানায়। গাস্তঁ জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছে, আমায় দেখতে পায় নি।

"কি মঁসিয় গাস্তঁ, একা এখানে?"

ও ঘুরে দাঁড়াল।

"মাদমোযাজেল মার্গরিৎ, আজ আর বাড়ির বাইরে এক পা-ও যেতে পারবে না।"

বড় বড় বরফের কুচি পড়ছে।

"তাতে কি, দিনটা যা সুন্দর লাগছে, এমন দিনে কোন মতেই আমি দুঃখিত হব না।"

"দেখ, খানিক বাদে কেমন বিরক্তি ধরে।"

"না বাপু, সে-শঙ্কা আমার নেই।"

কঁতেস এলেন।

"দ্যনোয়ার শরীর আবার খারাপ হয়েছে, সেই মাথাধরা।"

"তবে ও এখন আসবে না?" আমি জানতে চাইলাম।

"আসবে না? যা একগুঁয়ে, শরীরটার যত্ন কোন দিন নিতে দেখলাম কই?"

ইতিমধ্যে জমিদার এসে হাজির হল। আমায় সুপ্রভাত জানাল। কি ফ্যাকাশে লাগছে ওকে। স্বচ্ছ চামড়ার ভেতর দিয়ে নীল শিরাগুলো

কপালের দুই পাশে যেন ফুঁড়ে বেরুচ্ছে।

"উঃ, কাল সারা রাত একটুও ঘুমুতে পারি নি।"

গাস্ত্ঁ বেরিয়ে গেল।

"নিচেতে তুই এলি যে দ্যানোয়া ?" ওর মা বকলেন, "আয়, এই সোফাটায় শুয়ে পড় দেখি !"

ও সশব্দে শুয়ে পড়ল চোখ বুজে।

"তোর খাবার এখানেই আনব। নড়িস না যেন এখান থেকে।"

ও ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। আমরা খাওয়ার ঘরে গেলাম। প্রাতরাশের পর কঁতেস নিজে দ্যানোয়ার জন্য কফি নিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি ট্রেটা নেব বলে ধরাধরি করতে উনি আমার হাতে দিলেন বাধ্য হয়ে। দ্যানোযা কিছুই খেতে পারল না, অসম্ভব তেষ্টা পেয়েছে বলে কাপ দু-এক দুধ-কফি খেল। আমার মনে হল জমিদার আর তার ভাইয়ের মধ্যে তেমন যেন সদ্ভাব নেই ইদানীং। দিনান্তে একবারও ওদের একসঙ্গে দেখা যায় না আজকাল। জমিদার আমায় অনুরোধ করল কিছু পড়ে শোনাতে। ওর কাজে নিজেকে নিযোগ করতে পারব,—এর বড় সুখ আর আমার কি আছে ? আমি পড়েই চললাম। ক্রমে ক্রমে ও ঘুমিয়ে পড়ল। অনড় অচল ভাবে আমি বসে রইলাম, পাছে ওর ঘুম ভেঙে যায়। আগুনের দিকে তাকিয়ে আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না, কি এমন ঘটেছে যার জন্য ও এত বিচলিত হয়ে উঠেছে ? নিশ্চয় ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে এমন কেউ কিছু করছে যার ফলে এই অবস্থা,—ঘুমের ঘোরে কেমন যেন শিউরে উঠছে ; অর্ধস্ফুট আর্তনাদ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে, ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মাঝে ও আকুল হয়ে উঠছে, একবার ওকে জাগিয়েই দিচ্ছিলাম ; কিন্তু খানিক বাদে ও নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমিয়ে পড়ল। ওর মা এলেন ; ও ঘুমুচ্ছে দেখে উনি আমার পাশে এসে বসলেন ; আমি ওঁর কোলে মাথা রাখলাম। আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে উনি ছেলের দিকে তাকালেন।

"ওকে তুই ভালবাসিস ?"

আমি চুপ করে রইলাম।

"হুবহু বাপের মতই দেখতে হলে কি হবে, তাঁর মত স্বভাবধৈর্য ও পায় নি। ইচ্ছে ছিল ওর বিয়ে দেব। তোর মত একটি পাত্রী যদি পেতাম পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুজতাম।"

লজ্জায় আমি অধোবদন দেখে উনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই ওকে ভালবাসিস ?" ওঁর আঁচলে আমি মুখ লুকোলাম দেখে উনি বলে চললেন, "কেন মা, এত লজ্জা পাচ্ছিস ? ও কি তোর যোগ্য পাত্র নয়, না তুই ওর যোগ্য নয় ? ওর স্ত্রীরূপে তোকে দেখি বড় সাধ আমার অন্তরে। মায়ের যত্ন নিয়ে ওকে ভালবাসবার, দেখা শোনা করবার একজন কেউ আছে জানলে মনে বড় সান্ত্বনা পেতাম।" আমার মুখে উনি চুমো খেলেন।

"জানিস মা, সমস্ত বুক দিয়ে তোকে ভালবাসি আমি, কারণ তুই আমার হ্যনোয়াকে ভালবাসিস যে।"

আস্তে আস্তে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল ওঁর গাল বেয়ে। পড়ল আমার চুলের ওপর।

"কঁতেস হলে তোকে যা মানাবে"—উনি বললেন। হাতে হাত রেখে আমরা ঘণ্টাখানেক ওই ভাবে বসে রইলাম। সজোরে হঠাৎ দরজা খুলে গেল। গাস্ত ঁ ঢুকল। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারা করলেন কঁতেস। ততক্ষণে কিন্তু ওর ঘুম ভেঙে গেছে। হঠাৎ ওভাবে ঘুমিয়ে পড়ার দরুন প্রথমেই ও অপ্রতিভ হয়ে আমার কাছে ক্ষমা চাইল। ও যে একটু ঘুমুতে পেরেছে, তাতেই আমি সুখী, ওকে বললাম। প্রসন্ন হাসিতে ওর মুখ ভরে উঠল ; আমার হাত ধরে বলল, "আর কেউ হলে খুবই বিরক্ত হত ; কিন্তু তোমার হৃদয় যে অতি প্রশস্ত মাদমোয়াজেল মার্গরিৎ !"

অধীর আনন্দে আমি গেলাম আমার ঘরে। নতজানু হয়ে বসলাম।

সন্ধ্যাবেলা খাবার পর আমার ঘরে যাচ্ছিলাম ; বৈঠকখানায় জমিদার দেখলাম কঁতেসের পায়ের এক পাশে বসে আছে। আমি তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছি দেখে কঁতেস ডাকলেন, "আয় মা, অন্য পাশটা তোর পথ চেয়েই খালি রেখেছি ; তুই যে আমার আর একটি সন্তান !"

আজ সকালে খাবার ঘরে কাউকে দেখলাম না ; কঁতেস এলেন একটু পরে। "ফ্র্যানোয়া, গাস্তঁ—এরা কই ?"

"জানি নে বাছা।"

বুড়ো চাকর আর্তুরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ রে, দাদাবাবুরা কোথায় গেল ?"

"ভোরবেলা দেখেছিলাম মঁসিয় ফ্র্যানোয়া আর মঁসিয গাস্তঁ একের পর এক বেরিয়ে গেল।"

"কি আশ্চর্য ! তাই নাকি ?—চল, মার্গরিৎ, ওরা এসে পড়বে খানিক বাদেই।"

ওঁর কথা শেষ হতে না হতেই বড় ছেলে এসে ঢুকল। ক্রুদ্ধ, বিরক্ত ওর চেহারা ; কুঞ্চিত ভ্রূর তলায় যেন বিজলী চমকাচ্ছে।

"তোর কি হয়েছে বল ত ফ্র্যানোয়া, এই ঠাণ্ডার দিন সাত সকালে গিয়েছিলি কোথায় ?"

"ভাবলাম, বুঝি একটু বেড়িয়ে এলে ভাল হবে", বলে ও সহজ ভাবে হাসার চেষ্টা করল।

"গাস্তঁ কই ?"

"তা কি করে বলব ?" ঝড়ের বেগে জবাব এল।

বিস্ময়ে ও উদ্বেগে কঁতেস মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন সময় খুশী মনে গাস্তঁ এল। দুজনের মধ্যে এমন কিছু হয়েছে, যার ফলে খেতে বসে কেউ একটা রা কাড়ল না।

গাঁয়ের পাদরী মঁসিয় রেকামিয়ে আজ রাতেও খাবার সময়

এসেছিলেন। গাস্ত‍ঁকে কি একটা জরুরী কাজে ওর বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেলেন। ও প্রথমে রাজী হয় নি; শেষ পর্যন্ত যেতে হল ওর আদেশে।

জমিদারের অসুখ করেছে। বেশ বাড়াবাড়ি, ওর মাকেও এই কথাই বলতে শুনলাম। বৈঠকখানায় ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময় ওর কাতর কণ্ঠ ভেসে এল।

"পারছি না মা, অসহ্য, উঃ, আর জোর কোর না।"

কঁতেসের মোলায়েম গলা শুনলাম, "না বাপ, তোর শরীরটা খারাপ হয়েছে কি না।"

"হ্যাঁ, মা গো, বেশ বুঝছি, দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েছি।"

আমি চলে এলাম। ঘরে গিয়ে ছিটকিনি এঁটে দিলাম। ও অসুস্থ —বেশ গুরুতর কিছু তা হলে। মনে হল বিরাট এক অমঙ্গল ঘনিয়ে আসছে আমার চার ধারে। না গো না, ভগবান। ও যেন মরে না। ভগবান! রক্ষা কর ওকে। ওব শেষ পর্যন্ত অসুখ। উঃ, কানে বাজছে এখনও ওর আর্ত স্বর, "হ্যাঁ মা গো, দারুণ অসুস্থ হযে পড়েছি, ভযানক অসুস্থ!"

দয়াময়, ভাল করে দাও ওকে, সারিয়ে তোল! ও যেন আমায় ছেড়ে না যায়। বহুক্ষণ হাঁটু গেড়ে তাঁকে স্মরণ করলাম। উঠে দাঁড়ালাম তারপর, বেশ শান্তি ও সান্ত্বনা নিযে। নিচের ঘরে গেলাম। কঁতেস সোফায বসেছিলেন। ও তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল। বড় ব্যাকুল, বড় বিপন্ন লাগল কঁতেসকে। সহজ ভাবেই আমার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করলেন। নির্বাক আয়ত চোখ মেলে দ্যুনোয়া আমায় দেখছিল। অপূর্ব এক মাধুর্য ওর চোখে। আমি প্রশ্ন করলাম, "এখনও কি মাথা ধরা আছে?"

"নাঃ, তবে বড় ক্লান্ত লাগছে; ভয়ের কিছুই নয়।"

ওর মা উঠে গেলেন। বেশ বুঝলাম, দারুণ কান্নার বেগ উনি এতক্ষণ

সামলে ছিলেন। একটু বাদেই গাস্তঁ এসে জুটল। কোথায় কোথায় ঘুরছিল কে জানে! ও আমায় বলল, "বাইরে দারুণ দুর্যোগ চলেছে।"

"মরতে তবে বেরিয়েছিলে কেন?" ঝাঁঝিয়ে উঠল ওর দাদা।

"কারণ..." হেসে সলজ্জ উত্তর দিতে গিয়ে ও থেমে গেল।

দ্যুনোয়ার এই উগ্র মেজাজের পরিচয় পেয়ে বড় দুঃখিত হলাম। কাল বাড়ি যাব ঠিক করেছিলাম। কঁতেস ছাড়ছেন না বলে সতেরই যাব কথা হল।

রাত দশটা নাগাদ, শুতে যাবার আগে জানলাটা খানিক খুলে দিলাম। বন্ধ ঘরে দম নিতে কষ্ট হচ্ছিল। শুনতে পেলাম জানলার ঠিক নিচে গুন্ গুন্ করে গাস্তঁ একটি 'রঁদো' গাইছে।

* * * *

গাইতে গাইতে ও চলে গেল। গানের বেশ আস্তে আস্তে দূবে মিলিয়ে যাচ্ছে। থেকে থেকে গলাটা যখন চড়ছে, আবার ভেসে আসছে ছাড়া-ছাড়া কলি,—

"একটি শুধু মক্ষিকা · ...আর দ্বিধা কেন
লো চাষানি?"

জানলা বন্ধ করে দিলাম। ভগবান, সব অমঙ্গল থেকে আমাদের দূরে রেখ।

কি করে লিখি? কোন্ মুখে বলি? হায় রে। হায়। এ যা দেখলাম তার আগে আমার মরণ হল না কেন ভগবান? উঃ, কেন এর আগে মাটি হয়ে আমি মিলিয়ে গেলাম না? কত অন্যায়, কত বেদনার অভিজ্ঞতা নিয়েই না ধর্মপুস্তকে লেখা আছে, "মৃতদের আমি আশীষ জানাই জীবিতদের চেয়ে বেশী।'—হে ভগবান, এ কী মর্মন্তুদ কাহিনী আজ আমায় লিখতে হচ্ছে। দয়াময়, পাপী আমরা, আমরা চলেছি অসহায় ভেড়ার মত—কোন্ পথে জানি না। ক্ষমা

কর আমাদের, টেনে নাও আমাদের তোমার বিশাল বুকে। উঃ! ভ্রাতৃহত্যা! এত মহৎ, এত সদাশয়, এত অমায়িক—কোন্ প্রাণে ও করতে পারল এই কাজ? মায়ের পেটের ভাই, নিজের ছোট ভাই, তাকে—উঃ, এর চেয়ে শত বার মৃত্যুও যে অধিক সহনীয়! দয়াময় ওকে ক্ষমা কর। ক্ষমা করবে দয়াময়? অসীম ত তোমার কৃপা, অসুস্থ ও, দারুণ অসুস্থ! নিজের ইচ্ছাধীন থাকলে এ-কাজ ও কখনও করতে পারত না, হলফ করে বলতে পারি। রোগের ঘোরেই এমন পাপ সম্ভব হল। ভাইকে বুক দিয়ে ও ভালবাসত, ভালবাসত প্রাণের অধিক, কোন দিন তিরস্কার অবধি করে নি। দয়াময় যীশুখ্রীষ্ট, ক্ষমা কর ওকে, উদ্ধার কর ওকে ওর পাপ থেকে, ওর সঙ্কট-মুহূর্তে ও চায় সান্ত্বনা।

পনেরোই ডিসেম্বরের কথা। ভোর পাঁচটায় হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল। এক লাফে উঠে দাঁড়ালাম। জানলা খুললাম। সব চুপচাপ। প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়েই রইলাম। ফের শুতে যাচ্ছি, এমন সময় মনে হল একসঙ্গে অনেকগুলো গলা শোনা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি যা হোক একটা গায়ে চাপিয়ে অতি দ্রুত নেমে গেলাম সিঁড়ি বেয়ে। ভাল করে তখনও অন্ধকার কাটে নি। সুদীর্ঘ করিডোরের আধো আঁধারে ঠাহর করে দেখি, কারা যেন দাঁড়িয়ে সেখানে! আমায় দেখে বুড়ী দাইটা ছুটে এল।

“মাদ্‌মোয়াজেল, এ কি হল? হায় মা! বাঁচাও ওকে পুলিশের হাত থেকে!” ও ডুকরে উঠল।

চোখে পড়ল দুটি পুলিশের মাঝখানে জমিদার। হাতে কড়া, অফিসার ভদ্রলোক আমার কাছে এলেন।

“এ সব কি হচ্ছে কি?” ভর্ৎসনার সুরে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, “যাঁকে বন্দী করেছেন, তিনি প্লুয়ারভেনের জমিদার, তা জানেন?’

আমার গলা শুনে জমিদার ফিরে তাকাল। অফিসারটি উত্তর দিতে

যাচ্ছিলেন, আমি বাধা দিলাম, "নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনও ভুল আছে, আর সে ভুলের কৈফিয়ৎ দেবার জন্য আপনারা প্রস্তুত থাকুন।"

অফিসারটি বললেন, "মাদমোয়াজেল, ভুল হলে ত বর্তে যেতাম; কিন্তু অস্বীকার করবার আর পথ নেই, জমিদার তাঁর ভাইকে খুন করেছেন।"

"ভাইকে খুন করেছেন?" আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। জমিদারের দিকে তাকালাম; ওর বিস্ফারিত চোখ দুটি খাবার ঘরের টেবিলের উপর নিবদ্ধ। নাক দারুণ ফুলে উঠেছে, ঠোঁটে কঠিন নির্মমতা —কি মর্মান্তিক যন্ত্রণায় ও জ্বলে মরছে আমি স্পষ্ট আঁচ করতে পারলাম। তবু অফিসারকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, এর মধ্যে নির্ঘাত কোনও ভুল আছে।

"দয়া করে এদিকে একবার আসবেন?" খাবার ঘরের দরজা খুলে উনি আমায় ডাকলেন। গেলাম। উনি ভেতরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এ কী? উঃ যা চোখে পড়ল, জীবনে কখনও ভুলব না। গাস্তঁর দেহটা টেবিলের উপর শোয়ানো। ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক করা; কাচের মত স্বচ্ছ চোখ দুটি অস্বাভাবিক ভাবে যেন তাকিয়ে আছে। জামা-কাপড় কালো রক্তে ভরা; আর ডান দিকের বুকটা গুলিতে ছ্যাঁদা হয়ে গেছে!

"এ কি সত্যিই ওর ভাইয়ের কীর্তি?" অস্ফুট স্বরে আমি বললাম।

"আজ্ঞে হ্যাঁ মাদমোয়াজেল!"

"ঠিক জানেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ মাদমোয়াজেল; জমিদার নিজে এসে আমাদের হাতে ধরা দেন—যখন আমরা টহল দিচ্ছিলাম।" সখেদে উনি জানালেন।

দরজা খুলে দ্যুনোয়ার কাছে গেলাম। ওর হাতে হাত রাখলাম, চোখ তুলে তাকালাম ওর দিকে। হায় রে! কি পরিবর্তনটাই না ঘটে গেছে! ডাগর দুটি চোখে যেন আগুন ছুটছে। দুই রগের শিরা

ফুলে দপ-দপ করছে।

"ছ্যনোয়া," আমি নিচু গলায় ডাকলাম, "তোমার শরীর খারাপ, চল, যাবে আমার সঙ্গে?"

অদ্ভুত ফল ফলল আমার কথায়। চট করে ও ফিরে দাঁড়াল; দৃষ্টি খানিক কোমল হয়ে এল; এক ঝলক হাসি দেখা দিল। আমার বুক যেন ভেঙে চৌচির হয়ে গেল; মা গো, এত যন্ত্রণা!

"তোমার সঙ্গে? হাজারবার যাব, এখুনি যাব।" ও জবাব দিল। তার পর ওর নজর পড়ল শেকল-বাঁধা হাতের দিকে। কেমন যেন উদাস অসহায় দৃষ্টিতে ও তাকাতে লাগল। ভয় পেলে শিশুরা যেমন করে, সেই ভাবে ও আর্তনাদ করে উঠল।

"মার্গরিৎ, মার্গরিৎ, এ কী?"

ওকে মুক্ত করে দিয়ে আমি ওর সঙ্গে পাশের ঘরে গেলাম। নীরবে আমার কথামত ও চলতে লাগল। দরজাটা আমি বন্ধ করে দিলাম। দুই হাতে মাথা চেপে ধরে ও একটা সোফায় শুয়ে পড়ল। ওর পাশে বসে ওর দিকে চেয়ে রইলাম আমি। হায় প্রিয়! কত তোমায় ভালবাসি তুমি জান না। আমার হাতে তুলে নিলাম ওর হাত। সারা গায়ে যেন জ্বর হয়ে যাচ্ছে। দারুণ গরম। আমি চুপ করে রইলাম —এমন সময় কঁতেসের মিষ্টি আহ্বান শুনলাম।

"কি হল রে? কই, আমার বাছারা কই?"

হুড়মুড় করে ছ্যনোয়া উঠে বসল। দরজার দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে ও যেন কান পেতে কি শুনতে লাগল।

"মা, মা গো!" ও নিজের মনেই আওড়াতে লাগল।

খাবার ঘরের দরজা খুলল কে; তার পরই বুকফাটা এক চিৎকার শুনে ছ্যনোয়া হকচকিয়ে গেল। আবার শোনা গেল মহা আতঙ্কে ভরা সেই আর্তনাদ, "ওরে গাস্ত, বাবা, বাছা রে আমার!"

খানিকক্ষণ কান্না আর ফিসফাস শব্দের দারুণ রোল উঠল; তার

পর সব থেমে গেল হঠাৎ। উঠে গেলাম; ওই কান্নার ভয়ে সজোরে চোখ দুটি বন্ধ করে ছিল দ্যানোয়া; আমি নড়তেই ও শিউরে উঠল। আবার নীরবে বসে রইল। আমি বেরিয়ে গেলাম। কঁতেস আমার দিকে ছুটে এলেন, "মার্গরিৎ, মা, এ আমার কি হল মা?" অদম্য কান্নায় উনি ভেঙে পড়লেন।

"চুপ, চুপ!" আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, "পাশের ঘরেই ও রয়েছে; অবস্থা উদ্বেগজনক! আপনাকে ওর একান্ত প্রয়োজন!"

ঘরে ঢুকে উনি দু হাতে আঁকড়ে ধরলেন জীবিত পুত্রকে। আমি লোকজন সমেত অফিসারকে চলে যেতে আদেশ দিলাম; ঘরে গিয়ে দেখি উনি কাঁদছেন; এত হট্টগোলের কোন অর্থই দ্যানোয়া বুঝতে পারছে না। অবাক-বিস্ময়ে মূঢ়ের মত তাকিয়ে আছে মায়ের দিকে। তিন তলায় কঁতেসের ঘরে মা-ছেলেকে নিয়ে গেলাম। ওখানেই ওঁদের রেখে চলে আসছিলাম; কঁতেস আমার হাত ছাড়লেন না।

"যাস নে!" উনি বললেন। বসে পড়লাম আমি। "দ্যানোয়া, এ তুই কি করলি বাপ? কেন এমন করলি দ্যানোয়া?" ওর আচ্ছন্ন মুখের দিকে চেয়ে উনি প্রশ্ন করলেন। সবিস্ময়ে ও তাকাল, তার পর বিরক্তির সুরে অনুরোধ করল, "মা-মণি, বড় ঘুম; আর পারছি না— মাথার এই জ্বালা!"

ওর মাথা উনি বুকে টেনে নিলেন। দ্যানোয়া চোখ বুজল। কপালে হাত রেখে ও স্বগতোক্তি করল, "উঃ মা, বড় জ্বলছে।"

খুঁটিয়ে সব কথা ওকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন ওর মা। আমি বাধা দিলাম। ডাক্তার ডাকতে পাঠালাম। মঁসিয় শাঁতো অবিলম্বে এসে পড়লেন। ওঁর পেছন পেছন আমি বৈঠকখানায় গেলাম। আমার বর্ণনা উনি খুব মন দিয়ে শুনলেন। জবান শেষ হলে বললেন, "শুনে মনে হচ্ছে উন্মাদ অবস্থায়ই এ-কাজ ও করেছে। দুর্ঘটনার কারণ কিছু জান? পূর্বাভাস?"

"না ; নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব কোন দিনই ওদের ছিল না। দুজনাই দুজনকে খুব ভালবাসত।"

"ঝগড়া-ঝাটি কিছু হয়েছিল ?"

"না, তবে গত মাস থেকে জমিদারের হাব-ভাবে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম ; কেউ সেদিকে বিশেষ নজর দেয় নি।"

করুণা ও স্নেহমিশ্রিত নয়নে উনি আমার দিকে তাকালেন, "তোমার বাবার কাছে খবর দিয়েছ ?"

"আমি দিই নি, তবে এতক্ষণে ওঁর কানে কথাটা উঠেছে নিশ্চয।"

অল্পক্ষণ চুপ করে উনি জানতে চাইলেন, "আচ্ছা, জমিদারকে কি একবার দেখতে পারি ? ওর অবস্থাটা ঠিক মত জানা দরকার ; মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফলেই এ-কাজ ও করেছে যদি প্রমাণ করা যায়, বিচারের সময় তবে অনেক সুবিধে হবে।"

ওঁর এ-কথা শুনে আমি বুঝতে পারলাম কি লাঞ্ছনাটা ওর কপালে লেখা আছে ; ওকেই যে আমি সঁপেছিলাম আমার হৃদয, মন। ওকে আমি অন্তরের গভীরতম অনুভূতি দিয়ে ভালবাসি। ভগবান যেন ওর সহায় হন।

দযাময়, চেয়ে দেখ ওর বিপত্তি, ক্ষমা কর ওর পাপ।

কঁতেসের ঘরে গেলাম। ডাক্তারবাবু খুব সহজ সুরে কথা সুরু করলেন, "এই যে দ্যুনোয়া, কেমন আছ হে ?"

ও তাঁর দিকে চেয়ে রইল। হাসল, "মনে হচ্ছে ভালই।"

"নাড়ী দেখি ?"

এই অল্প সময়ের মধ্যেই ওকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিলেন তিনি অতি মনোযোগ দিয়ে।

"আচ্ছা, কোথাও ব্যথা লাগছে ?"

"আজ্ঞে, এইখানে।" বলে ও কপাল দেখাল।

"তাই নাকি ? বলতে হয়। এখুনি সারিয়ে দেব।"—এই জাতীয়

কথাবার্তার ফাঁকে ভাল ভাবে গুছিয়ে উনি নানা প্রশ্ন করলেন। চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিতে আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন।

"ওর অসুখ খুবই বাড়াবাড়ি কি ?"

"মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। সর্বদা ওর দিকে নজর রেখ, আর যাতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম পায়, সে ব্যবস্থা কর ; আর ভুলেও এ-ঘটনার উল্লেখ ওর কাছে কোর না। একটা কথা, ওর মামা কোথায় এখন ?"

কর্ণেল দেক্রে এখন স্পেনে। তাঁর ঠিকানা দিলাম।

"এখুনি ওঁকে টেলিগ্রাম করছি। ওঁর আসা নিতান্ত প্রয়োজন। তবে মার্গরিৎ নিজের শরীরটার দিকে যদি নজর না দাও, ভুগতে হবে যে মা !"

উনি চলে গেলেন। রোগীর ঘরে গেলাম আমি। ম্যুনোয়াকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওর তন্দ্রা আসছিল। কঁতেসকে ইশারায় ডাকলাম। খুলে বললাম সব কথা। উনি নীরবে কাঁদতে লাগলেন।

ম্যুনোয়া ঘুমিয়ে পড়ল। কি অস্বাভাবিক ফ্যাকাশে লাগছে ওকে ! হঠাৎ ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে বকতে আরম্ভ করল, "ওই যে, আগুন ! আগুন ! পাগল করে দেবে ! উঃ, পুড়িয়ে দিল সব !"

চট করে একটা ভিজে রুমাল নিয়ে ওর কপালে রাখলাম। ও তা ফেলে দিল। বিকারের ঘোরে সজোরে আমার হাত চেপে ধরল। বাবা আর মা এলেন। বৈঠকখানায় গেলাম। আমায় ওঁরা নিয়ে যেতে এসেছেন। আমি ধরে বসলাম, এখানেই আমায় থাকতে দেওয়া হোক। অতিকষ্টে ওঁদের মত পেলাম। মা-ও থাকবেন বলে জিদ করাতে আমি আপত্তি জানালাম।

ওর অবস্থার পরিবর্তন হয় নি। গায়ে বেশ জ্বর। গত দুই সপ্তাহ অনবরত প্রলাপ বকছে, বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছে, রাতে ঘুম নেই। কি নিদারুণ ভোগান্তি ! ভগবান, একবার এদিকে ফিরে তাকাও,

ভগবান! এতদিন পর ওর মা একটু বিশ্রাম নিতে গেছেন। আমরা এখন পালা করে ওর শুশ্রূষা করছি। উনিশ তারিখ সকালে ওর মামা এসে পৌঁচেছেন! আমায় দেখে উনি অসম্ভব বিচলিত হয়ে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। ওঁকে আদ্যোপান্ত কাহিনী জানালাম।

"হায় ভগবান!" উনি আপন মনে বলতে লাগলেন, "কি যে করি এই অবস্থায়!"—তার পর হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন, "না না, ওর বিচার—কোনও দরকার নেই; চলে যাব এখান থেকে ওকে নিয়ে!"

ঘটনাটা ওঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছে। আমি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। ধীরে ধীরে উনি সামলে নিচ্ছেন বুঝলাম। আমার হাত দুটি ধরে উনি শুধালেন। "আচ্ছা মা, ওকে তুই এখনও ভালবাসিস?" নিরুত্তর মুখে আমি তাকালাম ওঁর পানে। ওঁর পক্ষে আমার উত্তর পড়ে নিতে দেরি হল না।

"বেচারা মা আমার!" বলতে গিয়ে দু ফোঁটা জল ঝরে পড়ল ও র গাল বেয়ে।

কাল রাত্রে দ্যুনোয়া বেশ ভাল ছিল। শান্তিতেই ঘুমিয়েছিল। রাত তিনটে নাগাদ বসেছিলাম ওর বিছানার ধারে। আমার কাঁধে ও হাত রাখল। আধশোয়া অবস্থায় ও জানলার দিকে নির্দেশ করে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল,—

"ওই যে দেখছ—যীশু হচ্ছেন উনি, যিনি মৃত, যিনি পুনরুজ্জীবিত, যিনি ভগবানের ডান দিকে বসে আছেন, আর আমাদের পক্ষ সমর্থন করে প্রার্থনা করছেন সুবিচার।"

ও টেনে টেনে শেষের কথাগুলো বলল। তৃপ্তির হাসিতে ওর মুখ উজ্জ্বল। আমি কি বলতে গেলে ও থামিয়ে দিল, "চুপ, চুপ! শোন, ওই শোন!"

একদৃষ্টে, অত উৎকর্ণ ভাবে ও কি দেখছিল জানি না! দিগন্তে চাঁদ আর তারার উদ্ভাস। বেশ কিছুক্ষণ পরে ও আবার ধপ করে শুয়ে পড়ল।

"সব শেষ!" করুণ কণ্ঠে ও জানাল।

ও আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ভগবান যেন মুখ তুলে চেয়েছেন মনে হয়। ওর পাপ উনি নিশ্চয় ক্ষমা করবেন। আমরা কে-ই বা নিজেকে নিষ্পাপ বলতে পারি? অবিরত শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছি, ভেড়ার পালের মত নিজের নিজের পথে আমাদের চলা ছাড়া উপায় নেই; তাই ত চিরন্তনের আদেশে যীশু টেনে নিয়েছেন আমাদের সমস্ত পাপ তাঁর নিজের অঙ্কে। ভগবান—আমাদের ঈশ্বর কি সর্বদা বলছেন না, "আমি, আমিই মুছে দিই তোমাদের পাপ-তাপ, যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পার আমার ভালবাসা,—আমি ভুলে যাব তোমাদের যাবতীয় পাপ।"—ভগবান, ক্ষমা কর ওর পাপ, ওর প্রতি মেলে ধর তোমার বরাভয়-পাণি, তোমার মাঝেই ওর আত্মা যেন খুঁজে পায় পরম শান্তি।

সকালে জমিদারের অবস্থা দেখে ডাক্তারবাবু ত অবাক! প্রলাপের ঘোর কেটে গেছে, তবে মাথাটা এখনও দুর্বল, সামান্য বিকার আছে।

ওর বিছানার পাশে আজ সকালে বসেছিলাম। চোখ বুজে ও শুয়ে আছে দেখে ভাবলাম ঘুমুচ্ছে। কিন্তু একবার চোখ তুলে দেখি স্থির নয়নে আমার দিকেই ও চেয়ে আছে। ইশারায় আমায় কাছে ডাকল ও, "কি দুঃস্বপ্ন যে দেখছিলাম। গাস্তঁ কই? একবারও কই ও তো আমায় দেখতে এল না?"

আমি কি বলব ভেবে পেলাম না।

"এখনও ও কি আমার ওপর চটে আছে? ডাক না ওকে, ওর সঙ্গে মিটমাট করে নিই; যাও লক্ষীটি, ওকে ডেকে আন।"

আমি বেরিয়ে গেলাম। সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলেন মঁসির দেক্লে।

ওঁকে এ-কথা বলে আমি জানালাম যে সত্যি যা ঘটেছে ওকে এখন খুলে বলা বোধ হয় ভাল।

আমরা ঘরে ঢুকতে হ্যনোয়া সখেদে বলল, "বুঝেছি, ও আসতে চায় না এখনও।"

"ও আসতে পারে না বাপ!" কাঁপা গলায় ওর মামা জবাব দিলেন।

"কেন?"

"ও যে আর বেঁচে নেই!"

"এ্যাঁ, গান্ত মারা গেছে? আমার স্বপ্নই সত্যি হল?" ও ব্যগ্র ভাবে ওর মামার দিকে ঝুঁকে পড়ল, "আমি যে দেখলাম লেকের ধারে ও মরে পড়ে আছে, আর ওর চোখ উঃ, কি সে চাউনি! দারুণ ভাবে চেয়ে রয়েছে। আমি ওর কাছে যেতেই ওর নিস্পন্দ ঠোঁট দুটোর মধ্যে থেকে কে যেন গর্জে উঠল, 'কায়ঁ্যা প্রতারক!' অসম্ভব কর্কশ ওর গলাটা শোনাল। তবে কি এ-সবই সত্যি?"

"হ্যাঁ বাছা!"

"হায় রে!" বলে অমানুষিক চিৎকার করে ও পড়ে গেল বিছানার ওপর, নিথর, অচঞ্চল। মামা তাড়াতাড়ি আঁজলা-ভরতি জল দিতে লাগলেন ওর মুখে-চোখে। খানিক বাদে চোখ মেলেই আবার সভয়ে ও চোখ বুজল। আমাকে রোগীর কাছে রেখে উনি ডাক্তার ডাকতে গেলেন। ফের ও তাকাল, শূন্যদৃষ্টিতে; বহুক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। ওর কপালে কালিমা ঘনিয়ে এল; অব্যক্ত ভীতি ফুটে উঠল দুই চোখে। আমার হাত ধরে নীরস গলায় ও ধীরে ধীরে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, সত্যিই আমি···আমি কি···এ কাজ করেছি? কেন এমন করলাম? কে বলল?"—আমি চুপ করেই রইলাম।

"কই, তুমি উত্তর দিলে না? বল, বল না, এ কথা কি সত্যি?"

"হ্যাঁ, সত্যি।"

গভীর স্তব্ধতা নেমে এল চারি দিকে। মূক নয়নে পরস্পরের পানে আমরা তাকিয়ে রইলাম, নিষ্প্রাণ মূর্তির মত। মিনিট পনেরো প্রায় এই ভাবেই কাটল। এমন সময় ডাক্তার এলেন।

"বাঃ, তোমায় বেশ ভাবুক, দার্শনিক গোছের দেখতে লাগছে হে", উনি রসিকতা করলেন।

স্বপ্নোত্থিতের মত ম্যানোয়া তাকিয়ে রইল। পরে বলল, "ঠাট্টা না ডাক্তারবাবু ; আর সময় নেই। সবই এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি।"

খানিক দম নিয়ে ও বলে চলল, "উঃ, এমন নিরপরাধ প্রাণ হরণ করবার আগেই কেন আমার মৃত্যু হল না ?"

দু হাতে মুখ ঢেকে ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ডাক্তার আর কর্ণেল পাশের ঘরে চলে গেলেন। নিজেরই অজ্ঞাতে ওর পাশে বসে ওর চুলগুলি সযত্নে বিন্যস্ত করতে লাগলাম আমি। এই অসহ্য যন্ত্রণা চোখে দেখা যায় না। ও আমার হাত সরিয়ে দিল।

"জান না আমি কে ? আমি যে ভ্রাতৃহন্তা।" বিকৃত গলায় ও চেঁচিয়ে উঠল।—দারুণ ব্যথায় আমি মুষড়ে পড়ছিলাম ; কিন্তু না, এ-সময়ে ওকে প্রবোধ দেওয়াই আমার কর্তব্য। ওকে স্মরণ করাতে চেষ্টা করলাম, "আমরা করুণাময় ঈশ্বরের সন্তান।"

"হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে—তুমি আমায় ভালবাসতে, তাই না ? মার মুখে যেন শুনেছি সে কথা। এখনও ভালবাস ?"

"আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে তোমায় ভালবাসি। ভগবান কি আমাদের দিকে মুখ তুলে চাইবেন না ?"

"আমেন।" বলে ও আমার হাতটা তুলে নিল। বলল, "ভগবান আমাদের ক্ষমা করবেন, এ বিশ্বাস আমার অটুট।" ডাক্তার ফিরে এলেন।

"বুঝলে হে, দেহে-মনে এখন যত পার বিশ্রাম নাও!"

ওঁকে ও বাধা দিল, "মঁসিয় শাঁতো, আমি একদম সেরে উঠেছি।

রীতি-মাফিক বিচার শুরু হোক। আমার বিচারের দিন কবে ধার্য হয়েছে?"

"আগামী বাইশে।"

"আজ…হল…?"

"বিশ তারিখ।"

"পরশু দিন তবে?"

"হুঁ।"

"বেশ। আমি প্রস্তুত।"

ডাক্তার চলে গেলে পাক্কা চার ঘণ্টা ও দিব্যি শান্তিতে ঘুমিয়ে নিল।

আজ সন্ধ্যাবেলা ফাদার রোশেল ওকে দেখতে এলেন। সেণ্ট জন্‌এর চতুর্দশ অধ্যায়টি পড়ে উনি হাঁটু গেড়ে বসলেন, আমরাও বসলাম ওঁর দেখাদেখি। শুরু হল প্রার্থনা: আমাদের পাপ তিনি যেন হরণ করেন, রোগীকে করেন যেন কৃপা।

"ভগবান, তুমি," উনি ভক্তিবিনম্র কণ্ঠে বলে চললেন, "তুমি ত চাও না পাপীদের মৃত্যু হয়। তুমি চাও, তারা অনুতপ্ত হোক, পুনরুদ্ধার করুক তাদের আত্মাকে; প্রভু, ক্ষমা কর তোমার দাসানুদাসকে; ওর অন্তস্তলে জেগেছে আকুতি,—প্রেমময়, ক্ষমা কর, কৃপা কর।"

নীরবে আমরা অশ্রু বিসর্জন করছিলাম। পাদরী উঠে দাঁড়ালে হ্যানোয়া তাঁকে অনুরোধ করল নতমুখে, "পিতা, আশীর্বাদ করুন!"

ওর মাথায় হাত রেখে মঁসিয় রোশেল বললেন, "বিপদের মুহূর্তে পরম প্রেমিক যেন তোর আহ্বানে সাড়া দেন, আর তাঁর নামের মাঝেই তুই যেন খুঁজে পাস শ্রেষ্ঠ আশ্রয়!"

আজ জমিদার তার মাকে আদ্যোপান্ত ঘটনাটি বলল। ওর কাহিনী শুরু হতে আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম ঘর থেকে,—কঁতেস হাত ধরে আমায় বসালেন। অতি বিষণ্ণ নয়নে জমিদার আমার দিকে তাকাল; তার পর

ওর মাকে বলল, "মা, ও চলে যাক ; যে কাহিনী তোমায় বলছি, তা দুঃখের, বড় দুঃখের ; ওর শোনা উচিত হবে না।"

তবু ওর মা আমায় যেতে দিলেন না।

"না দ্যানোযা, ও থাক ; বেচারা তোকে যে প্রাণাধিক ভালবাসে। ওর কপালে এত দুঃখও ছিল !"

"হুঁ, এ সব শোনার পর প্রেম-টেম কর্পূরের মত উবে যাবে। তা ছাড়া আমার ওপর ওর ধারণাই বা কেমন হবে ?" ম্লানমুখে ও স্বগতোক্তি করল।

তার পর শুরু হল ওর কাহিনী : "অল্প কথায় বলছি, যা ঘটেছিল।—জানেৎ কোরেনকে দেখে আমি পাগল হয়ে উঠেছিলাম আর গাস্তঁও," দ্যানোয়া সসঙ্কোচে বলল, "ওকে ভালবাসত। গাস্তঁকে বহু বার সাবধান করে দিয়েছি, আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াতে বলেছি, আমার খুশিমত চলতে নির্দেশ দিয়েছি। সে-কথা কোন দিন ও কানেও তোলে নি। আর জানেৎ ওকেই বেশি ভালবাসত আমার চেয়ে। আমার ব্যবহার ওর মত মধুর নয় ; আমায় কেমন যেন ভয় করেই চলত জানেৎ। আমার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব ওকে বহু বার করেছি ; ও আমায় চায় নি ! আমি তখন যেন অন্য মানুষ,—আমি আর আমাতে ছিলাম না ;—এক দিন ফুটফুটে চাঁদিনী রাতে···দেখলাম, ওরা দুজনে বেড়াচ্ছে বাগানের সুরকি-ঢালা পথে।···এই অবধিই আমার মনে আছে। আর কিছু স্মরণে আসছে না। হায় রে কপাল ! কেন এর আগেই মরলাম না !"

দু হাতে মুখ ঢেকে ও প্রাণ-কাড়া কান্নায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। ওর মা-ও কাঁদছিলেন। আমি উঠে গেলাম, আমার হাতে তুলে নিলাম দ্যানোয়ার হাত। জানি না কেন এ রকম—পোষা কুকুর যেমন মনিবের মন খারাপ হলে তার হাত চেটে দেয়—সেই রকম ব্যবহার আমি করছিলাম। স্পষ্ট অনুভব করতে পারছিলাম ঘটনাবর্তের ধারা, তবু

কিছু গ্রাহ্য করবার শক্তি আমার ছিল না। সবই চলছিল যেন স্বপ্নের ঘোরে। আমায় দেখে, আমার বিবর্ণ চেহারা দেখে ফ্র্যানোয়া আঁতকে উঠল; আমার মাথায় হাত রেখে বিড়-বিড় করে বলতে লাগল, "বেচারা! কি কষ্টটাই না দিলাম!"

তার পর আমার দিকে ওর মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, "মা, এই দেখ, শেষ পর্যন্ত একেও কি মেরে ফেলব না কি? কি চেহারা করেছে এই ক'দিনে দেখ ত?"

আমায় ও সস্নেহে অনুরোধ করল, "যাও মার্গারিৎ, লক্ষীটি, ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম কর!"

শিশুর মত, বিনা বাক্যব্যয়ে আমি ওর আদেশ মেনে নিলাম। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল, পথ যেন শেষ হবে না। ঘরে গিয়ে ধপ করে বসে পড়লাম একটি চেয়ারে। কতক্ষণ আচ্ছন্ন ছিলাম জানি না, হঠাৎ দারুণ ভাবে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। চেয়ে দেখি, সামনের জানলাটা খোলা,—বাইরে তুষার পড়ছে। জানলা এঁটে দিলাম। চেয়ারে ফিরে যাবার সময় ক্রুশটার দিকে চোখ পড়ল; নতজানু হয়ে বসলাম আমার দিব্য-সাথীর চরণতলে। মনে নেই কি মিনতি জানালাম; কিন্তু প্রেমের ঈশ্বর, অন্তর্যামী—তিনিই আমায় বল দিলেন। বুক-ভরা সান্ত্বনা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। অন্তরে পেলাম পরম শান্তি। নিচে দেখা হল, মঁসিয় দেক্রে আর ফ্র্যানোয়ার সঙ্গে। আমার হাত ধরে কর্ণেল অভিবাদন জানালেন। ফ্র্যানোয়া খুবই মুষড়ে পড়েছে। আমার সঙ্গে মুখোমুখী হতেই ওর মুখে প্রসন্ন ভাব দেখা দিল। ও আমার দিকে চেয়ে হাসল।

আজ মামলার রায় বার হবে। ওখানে আমি যাই নি; যাবার সামর্থ্য নেই। গাড়িতে চড়ে ফ্র্যানোয়া আদালতে গেল; সঙ্গে ডাক্তার, কর্ণেল আর আমার বাবা। আশে-পাশে অজস্র পুলিশ-অফিসার। দিব্যি

শান্ত ভাবে ও গাড়িতে বসে ছিল। ভগবান, ওর মঙ্গল কর!

সন্ধ্যা।—বিকাল চারটেয় ওরা ফিরেছে। কর্ণেলের অনুরোধে প্রহরীরা দ্যুনোয়াকে নিয়ে এসেছিল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। আমাদের কাছ থেকে ও বিদায় নেবে বলে। আমি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিলাম; হৃৎস্পন্দন স্তব্ধপ্রায়। দ্যুনোয়া ধীর পায়ে এগিয়ে এল, হাসবার চেষ্টা করে আমার হাত জড়িয়ে ধরল।

"পনেরো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড!" উদাস ভাবে ও জানাল।

আমি কথা খুঁজে পেলাম না। পনেরো বছর! আত্মীয়-বন্ধুহীন অবস্থায় দিন কাটানো! এ যে মৃত্যুর সামিল। ঘটনার পর ত ওর স্বাস্থ্য প্রায় ভেঙেই গেছে!

"না গো, দ্যুনোয়া, এ দণ্ড যে বড় নির্মম!"

"ফুঃ! আমার একমাত্র দণ্ড মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নয়; রক্তের বদলে রক্ত!"

ও উত্তেজিত হয়ে পড়ছে দেখে আমি ওর হাত ধরলাম, "চল দ্যুনোয়া প্রার্থনা করি গে।"—ওকে নিয়ে গেলাম প্রাসাদের উপাসনালয়ে, যেখানে ধর্ণা দিয়ে ছিলেন ওর মা। বেদীর ওপর বরাভয়মুদ্রায় হাতবাড়ানো যীশুর ছবিতে লেখা, "এস আমার কাছে, তোমরা, যারা কর্মক্লান্ত, পর্যুদস্ত, এস, আমি লাঘব করব তোমাদের হৃদয়ভার।"

সত্যিই বুকে আজ আমাদের যে গুরুভার, তা বয়ে বেড়ানো অসম্ভব! হাঁটু গেড়ে বসলাম ওর মায়ের পাশে; উনি খপ করে ওর হাত চেপে ধরলেন। মুখে আমাদের ভাষা নেই; প্রার্থনা করছিলাম অন্তরের অন্তস্তল থেকে। দ্যুনোয়া দাঁড়িয়ে পড়লো। নিচু গলায় অনুমতি চাইল, "মা, যাই এবার?"

চট করে উনি টান-টান হয়ে দাঁড়ালেন, চেপে ধরলেন ওকে আকুল আগ্রহে, "না না। আমি দেব না, আমার একমাত্র সন্তানকে এভাবে আমি হত্যা করতে দেব না!" উনি গর্জে উঠলেন। ভীত দৃষ্টিতে উনি

কিছু খুঁজতে লাগলেন মনে হল। ওঁর কাঁধে হ্যুনোয়া আলতো ভাবে একটা হাত রাখল।

"মাত্র পনেরোটা ত বছর; দেখতে দেখতে কেটে যাবে। ভগবানকে সর্বদা স্মরণে রেখ মা।"—ধীরে ধীরে মার আলিঙ্গন থেকে ও নিজেকে মুক্ত করে নিল, সক্ষোভে উনি বেদীর সামনে বসে পড়লেন।

ও ঝুঁকে পড়ে বলল, "মামণি, বিদায় দিবি না?"

ওর গলা জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে উনি কাঁদতে লাগলেন। সহস্র চুম্বনে ওকে অস্থির করে তুললেন।

"ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।" উনি প্রার্থনা করলেন। তারপর সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন। জমিদার ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে, "আদিয়্য মার্গরিৎ, বিদায়!"

ডাগর চোখ দুটি তুলে ও প্রশ্ন করল, "নিত্য তোমার প্রার্থনার ক্ষণে বিপথগামী এই ভাইয়ের কথা স্মরণ করে করুণা-ভিক্ষা করবে ত?"

"হ্যাঁ," আমি জবাব দিলাম। ওর মার প্রসঙ্গ তুলে জানতে চাইল, "ওঁর নিঃসঙ্গ জীবনে একমাত্র সান্ত্বনা তুমি—ওঁকে মাঝে মাঝে দেখে যাবে ত?"

"হ্যাঁ।"

আবার ও আমার হাত জড়িয়ে ধরল। "যে ভালবাসা তোমার কাছে পেয়েছি, তার ঋণ ভগবান শোধ করবেন।"—বলে ও বেরিয়ে গেল। ইচ্ছা হল ছুটে যাই ওর পিছন পিছন, কিন্তু দেহে আর তিলমাত্র শক্তি না থাকায় বসে রইলাম, শূন্যহৃদয়ে। চারি দিকে ঘন অন্ধকার জড়ো হয়ে এল। আজ নিভে গেল আমার জীবনের সব আলো। অন্ধকারে ছোট ছেলেদের ছেড়ে দিলে তারা যেমন করে, আমিও তেমনি বিহ্বল হয়ে পড়লাম। বসলাম ওর মার অশ্রুসিক্ত সান্নিধ্যে। ভগবান, সাহায্য কর ভগবান! এই দুর্বার আঁধারে পথ দেখাও!

* * *

বহু কাল হল দিনপঞ্জী লেখা হয় নি। কঠিন অসুখ থেকে উঠেছি। অসম্ভব জ্বর আর প্রলাপে ভুগলাম। বাঁচবার আশা ছিল না। ভগবানই রক্ষা করলেন এ যাত্রা। চোখ খুলে যেদিন সূর্য দেখলাম, যেদিন দেখলাম আকাশের নীলিমা আর বাবা-মার আশান্বিত মুখ, ভগবানকে সেদিন ধন্যবাদ জানালাম। "আমায় তুমি সর্বদাই ঘিরে রেখেছ নিবিড় করুণায়!"—আগেকার জীবন আমার কাছে আজ স্বপ্নের মতই অস্পষ্ট, অবাস্তব। সপ্তাহ দুয়েক হল সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছি। তার আগেকার কথা যা স্মরণে আছে, বলছি।

এক দিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ মনে হল আমার ঘরে এক দল লোক, যেন ফিস-ফিস করে কি আলোচনা করছে। চোখ বুজে ছিলাম; এই আওয়াজ শুনে চেয়ে দেখি, দুই হাতে মুখ ঢেকে কে যেন আমার বিছানার কাছে বসে কাঁদছে। চোখ আমার বন্ধ হযে গেল; বাদামী ঢেউখেলানো চুল দেখে চিন্‌তে পারলাম,—কাপ্তেন লফেভার। প্রথম দেখা হওযা অবধি আমায় ও ভালবেসেছে প্রাণ-মন ঢেলে—প্রতিদানে আমি ওকে কি দিলাম? দিলাম শুধু বুকভরা ব্যথা। ওর প্রতি কেমন যেন সহানুভূতিতে আমার অন্তর ভরে উঠল। আমার মৃত্যুর দেরি নেই, তার আগে ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব আমার ভুলের জন্য। এই কথাই বারবার আমার মনে হতে লাগল। আরো কিছু দিন আগে যদি এ-ভাব আসত, যদি রাজী হতাম ওর প্রস্তাবে? ওর মাথায় আমি হাত রাখলাম।

"লুই আমায় ক্ষমা করবে?"

বড় দুর্বল লাগল নিজেকে,—অতি কষ্টে বার হল এই চারটে কথা। উত্তরে ও তুলে নিল আমার হাত, তার ওপর নেমে এল ওর ঠোঁট। চোখ ওর জলে ভরে উঠল।

"লুই, আমি ত যাচ্ছি; তুমি রইলে; বাবা-মার দেখা-শোনা কোর,—ওঁদের নিজের আত্মীয় ভেবে দেখা-শোনা কোর, কেমন?"

মনে কেমন ধারণা এল, মৃত্যু আমার সমীপবর্তী।

"বেচারা বাবা-মা! এই বয়সে ওঁদের যত্ন করার আর কেউ নেই। ওঁরা আমায় এত স্নেহ করেন,—আমার অবর্তমানে না জানি কত কষ্টই না হবে ওঁদের!"

ও নীরবে তাকিয়ে রইল আমার দিকে,—দুই চোখে দারুণ ব্যথার ছাপ, সজোরে ও ধরে রইল আমার হাত। ক্লান্ত চোখ দুটি বন্ধ করে ফেললাম। কে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরল।

"মা—মামণি!"

"বাবা।…"

তার পর আর মনে নেই। তার তিন দিন বাদে জ্ঞান ফিরল। বেশ দুর্বল লাগছিল। আমার ইচ্ছানুযায়ী আমার ঘরে আর কেউ ছিল না। আমি সেরে উঠছি দেখে মার মুখে হাসি ধরে না; আগের লালিমা ফিরে পেতে এখনও অনেক দেরী। আজ সকালে আমায় জড়িয়ে ধরে তিনি আনন্দে, দুঃখে কেঁদে ফেললেন।

"মার্গো, এ কি চেহারা হল তোর!"

তেরেস ওঁকে ধমক দিতে গিয়ে নিজেও কেঁদে সারা। "মাদাম," ও বলল, "এ-ভাবে ওর ঘরে বসে তুমি কাঁদছ দেখে ও কি নিজেকে সামলাতে পারবে? ডাক্তারবাবু না হাজার বার বলেছেন, ও যাতে উত্তেজিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে?"

মা হাসার চেষ্টা করলেন। তেরেসের মুখ একবার খুললে থামে না সহজে।

"কেন, ওর ফ্যাকাশে গাল দুটো কি খারাপ লাগছে নাকি? বরং খাসা লাগছে; এ কথায় অন্তত আর একজন আছে যে সায় দেবে, যখন সে এখানে আসবে। এমন ভাবে ওকে উত্ত্যক্ত কোর না মাদাম; এতে ওর মন খারাপ হয় না? কাপ্তেন সাহেব আসুক না একবার,—আহ্লাদ করা কাকে বলে দেখিয়ে দেবে একচোট।"

বাবা এসে আমার বিছানায় বসে আমায় আদর করলেন। তেরেস

চলে গেল ; মার থাকার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আমি বাদ সাধলাম ; আমি জোর করে ওঁকে বিশ্রাম করতে পাঠিয়ে দিলাম ; বাবাও আমায় সমর্থন করলেন ভাগ্যিস ; নয়ত উনি কি যেতেন ? বাবা তখন কথা পাড়লেন, "মামণি, এবার তুই সেরে উঠবি ! ভগবান সত্যি আমাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ।"

"হ্যাঁ বাবা ।"

খানিক বাদে স্বাভাবিক গলায় উনি বললেন, "জানিস মা, লুই তোকে দেখতে এসেছে ?"

"হ্যাঁ বাবা, ওকে যখন বিকারের ঘোরে দেখলাম, তখন আমার মনে কেমন যেন ধারণা হয়েছিল আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ।"

"সবাই তাই ভেবেছিল মা ; পারীতে খুড়িমার ওখানে তোর অবস্থার কথা শুনে লুই বেচারা পড়ি-মরি করে ছুটে এসেছে ।"

দীর্ঘ নীরবতার পর উনি বললেন, "কি একটা কাজে ও পারী গিয়েছে ; দু এক দিনের মধ্যেই এসে পড়বে ।"

"আচ্ছা বাবা, কঁতেসের খবর কি ?"

"বিশেষ সুবিধের নয় ; মাঝে মাঝে ওঁর মাথার গণ্ডগোল দেখা যাচ্ছে ।"

"আর ও ?"

"দ্যানোযা ? মারা গিয়েছে ; আত্মহত্যা করেছে ।"

"হায় ভগবান !" আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। শুনলাম, উন্মত্ত অবস্থায় ও একদিন এই অসহ্য জীবনের পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়েছে। ভগবান, ওর আত্মা যেন শান্তি পায় তোমার আশ্রয়ে। এখান থেকে বহুদূরে তুলঁর কাছাকাছি, কবরখানার বাইরে ওকে গোর দেওয়া হয়েছে। আমি, আমিও ত চেয়েছিলাম ওকে অনুসরণ করতে !

কাল আমায় বৈঠকখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ; নিজেই নেমে

যাচ্ছিলাম; কিন্তু কয়েক ধাপ নেমেই বসে পড়তে হল। বাবা হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "দাঁড়া খুকী, আমি তোকে নিয়ে যাবো; এখনও তুই বড় দুর্বল মা!"

আমায় উনি হাত ধরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন বৈঠকখানার সোফার উপর। মা এক গ্লাস সুরা এনে দিলেন। বাবা আমার কাছেই বসলেন; ওঁর কপালে আমি হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম; আমার অসুখের পর থেকে ওঁর কপালে দেখা দিয়েছে অজস্র রেখা।—আমি অনুযোগ করলাম, "বাবা, আমার অসুখের সময় তোমাদের খুব ভুগিয়েছি বুঝি?"

"হ্যাঁ মা, খুবই কষ্টে দিন কেটেছে আমাদের," কাঁপা গলায় উনি জবাব দিলেন দুই হাতে আমায় চেপে ধরে।

"তোমাদের ছেড়ে যেতে পারলাম কই? ভগবান আমায় মনে করিয়ে দিলেন যে তোমাদের প্রতি আমার যে কর্তব্য তা পালিত না হওয়া অবধি আমি নিজেকে তাঁর চরণাশ্রয়ের যোগ্য করতে পারব না।"

বাবা আমায় কোলের কাছে নিয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

কাল বিকেলে লুই এসেছে; বাবা আর আমি বাইরের ঘরে বসেছিলাম, দরজা খুলে গেল, আর আদলূফ কিছু বলবার আগেই ও এসে ঢুকল।

সাদরে ওর হাত বাবা চেপে ধরলেন নিজের মুঠোয়।

"হঠাৎ বোমার মত কোথা থেকে জুটলি লুই?'

ও আমার কাছে এল; ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমি বললাম, "স্বাগত লুই!'

আমি এত রোগা আর ফ্যাকাশে হয়ে গেছি দেখে ও যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। মাকে ডাকতে গেলেন বাবা।

লুই আমার হাত নিজের হাতে নিয়ে সরু সরু আঙুলগুলোর ওপর সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

"কি রক্তহীন তোমার চেহারা হয়ে গেছে মার্গারিৎ!" আমার দিকে ঝুঁকে ও অস্ফুট কণ্ঠে বলল, "বনফুল, তোমার ওপর দিয়ে যে বিরাট ঝড় বয়ে গেল!"

ও আমার এত কাছে এগিয়ে এল যে ওর ঠোঁট আমার কপালে অনুভব করতে পারছিলাম; হঠাৎ ও সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল, সরে গেল চিমনীর দিকে। ওকে বেশ বিচলিত লাগল; ওর চোখ কালো হয়ে উঠল। যখনই ও উত্তেজিত হয়, তখনই দেখেছি ওর চোখে ওই রকম কেমন একটা অন্ধকার ভাব ঘনিয়ে আসে। মাকে নিয়ে বাবা এসে ঢুকলেন। মা লুইকে জড়িয়ে ধরলেন; অবিরল জলধারা ওঁর চোখে।

"ওর চেহারা কত বদলে গিয়েছে, না রে লুই?"

"হ্যাঁ, কিন্তু বসন্তকাল এলেই আস্তে আস্তে আগের স্বাস্থ্য ফিরে আসবে।"

"সত্যি না কি রে?

"বাঃ, এ-কথা ত সবাই জানে।" বলে ও আমার দিকে চেয়ে হাসল।

"কি ভাবছ, সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই লুই আর আমি ওকে খাড়া করিয়ে দেব, কি বলিস লুই?"—বাবা ঠাট্টা করার চেষ্টা করলেও দেখলাম ওঁর চোখের কোণ চক্‌চক্ করছে। লুই এবার কিছুদিন থাকবে। সন্ধ্যাটা বেশ লাগছিল। লুই আর বাবা চিমনীর দুই কোণে বসেছিলেন। বাবার হাতে হাত দিয়ে আমি সোফায় শুয়েছিলাম। কাছেই বসে মা সেলাই করছিলেন। রাত দশটা বাজতে বাবা সবাইকে শুতে যেতে বললেন। আমি উঠলাম।

"উঁহু, তুই নিজে সিঁড়ি দিয়ে উঠবি কি করে?"—মা আপত্তি

জানালেন।

"দেখ না," আমি হাসলাম, "নামার সময় বাবার হাতে ভর দিয়ে কেমন অনায়াসে এলাম বল ত?"

"না না," বাবা বাধা দিলেন, "অসম্ভব, নামার চেয়ে ওঠা অনেক কঠিন।"

"একটু চেষ্টাই করি না কেন?" আমি বেঁকে বসলাম। দশ ধাপ গিয়েই দম নেবার জন্য বসে পড়লাম, বাবা তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন, কি যে ছেলেমানুষি করছিস, শরীর এতে খারাপ হবে!"

"একদম না।" আমি হাসার চেষ্টা করলাম। কিন্তু খুবই দুর্বল লাগছিল; ইতিমধ্যে লুই এসে পড়ল।

"এই ত লুই! ও-ই তোকে উপরে নিয়ে যাবে মা!"

"না বাবা," আমি আপত্তি জানালাম।

"যা যা," উনি উত্তর দিলেন, "ভয় নেই, ও তোকে ফেলে দেবে না, ওর গায়ে কি জোর জানিস?"

তার আগেই লুই আমায় তুলে ধরেছে। আমায় চুপি চুপি ও বলল, "মাথাটা আমার কাঁধে রাখ দেখি।"

ওর গলাটা যেন অন্য রকম শোনাল; বড় নিস্তেজ লাগছিল, ওর কথাই শুনলাম, কি অবসন্ন যে লাগছে। চোখ খুলে দেখি মা বসে আমার হাতে জল দিচ্ছেন আর তেরেস আমার জামা-কাপড় খুলে দিচ্ছে।

"এই ত জ্ঞান ফিরে এসেছে," ও চেঁচিয়ে উঠল।

উঠতে চেষ্টা করতেই তেরেস বাধা দিল।

"আবার কি করবি রে? যা ঘোলটা খাওয়ালি এখুনি!"

ওর কথা মানতেই হল। আমায় একটা গরম ড্রেসিং গাউনে ঢেকে দিয়ে ও বলল, "যাই মঁসিয়েকে ডেকে আনি—উনি কোথায় গেলেন মাদাম, জানেন?"

"ওই ত বাগানে কে যেন পায়চারি করছে," বাদাম গাছটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম।

"ও ত কাপ্তেন সাহেব," হেসে উত্তর দিল তেরেস।—খানিক পরেই বাবা এলেন।

"দেখছিস ত মার্গরিৎ, কি দুর্বল হয়ে পড়েছিস?"

"হ্যাঁ বাবা, কিন্তু সকালে কেমন দিব্যি তোমার হাত ধরে নেমে গেলাম; ভেবেছিলাম নিজেই বুঝি উঠতে পারব।"

জানলা দিয়ে চেয়ে উনি বললেন, "ওই ত শান্ত্রীর মত লুই টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে; তুই অজ্ঞান হয়ে গেছিস দেখে যা ভয়টা পেয়েছিল; বেচারা। ও তোকে কত যে ভালবাসে মা!" বলে উনি আমায় আদর করলেন।

"কিছু চাই না কি মার্গো?"

"না বাবা ঘুমিয়ে পড়গে, মাকেও নিয়ে যাও: দিন-রাত তোমাদের কি যন্ত্রণাই যে দিচ্ছি!"

আবার আমায় আদর করে উনি চলে গেলেন।

বাগানে মা আর আমি বসেছিলাম। দূরে দেখা যাচ্ছিল বাবা আর লুইকে। ওঁরা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতে বেরিয়েছেন; বাবা ওর নিজের ঘোড়ায়, লুই আমারটায়। বেশ কিছু দিন হল অস্ত্যারলিজের পিঠে চড়ি নি বলে ও একটু বুনো হয়ে উঠেছে। তাই লুই ওকে একটু তালিম দিতে নিয়ে গেছে, আমি সেরে উঠলেই যাতে অস্ত্যারলিজকে নিয়ে বেড়াতে যেতে পারি। ওরা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল দিগন্তে।

"লুই এবার বেশ কিছু দিন থাকবে এখানে," মা জানালেন, "চার পাঁচ মাসের ছুটিতে এসেছে। ও বাড়িতে এলে সব কিছুর রূপ কেমন বদলে যায়, কেমন যেন একটা স্ফূর্তির আমেজ এসে পড়ে। আর এই সময় তোর স্ফূর্তির একান্ত দরকার।"

"ছেলেটা বড় ভাল।"

মনে পড়ল গত বছর ওর প্রস্তাব আমি যখন প্রত্যাখ্যান করি,—বেচারা আমায় একটা কথা পর্যন্ত বলল না; সরল ব্যবহার দিয়ে, আমুদে মেজাজ দিয়ে ও আমায় একেবারে ভুলিয়ে দিয়েছে সেই অতীতের অপরাধ; মার বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

আমি মুখ ঘুরিয়ে বসলাম, দারুণ কান্না পেতে লাগল। মা-বাবার বাসনা আমি লুইকে বিয়ে করি। আমার ত মনে হয় ওঁদের সুখী করাই আমার কর্তব্য। বড়ই দুর্ব্যবহার করেছি ওঁদের সঙ্গে, ভগবান আমায় বাঁচিয়ে দিলেন এ যাত্রা, যাতে আমি নিজের কামনা-বাসনাগুলো দাবিয়ে রেখে ওঁদের ইচ্ছামত চলতে পারি, আর এই ভাবে তাঁর আশ্রয়ের যোগ্য হয়ে উঠি। ওঁরা আমার সেই দুর্ব্যবহারের কোন উল্লেখ মুহূর্তের জন্যেও করেন না; তবু সে কথা আমার মনে পড়ে যায়। ওঁরা এত ভালবাসেন আমায়, আমার উচিত ওঁদের কোন দাবী অপূর্ণ না রাখা। লুইকে বরাবর আমি একটু বিশেষ চোখেই দেখেছি, আর ওকে যদি বিয়ে করি তবে ভগবান আমায় শিখিয়ে দেবেন কি ভাবে যথার্থই ওকে ভালবাসতে হবে। তিনিই আমার ভরসা।

লুই আমাকে আন্তরিক ভালবাসে। ওকে কথা দিয়েছি, ওর জীবনসঙ্গিনী হব আমি। গত কাল সন্ধ্যায় আমি সোফায় শুয়েছিলাম, দরজার দিকে পিছন ফিরে। কার পায়ের শব্দ শুনলাম; লুই! আমার পাশে ও বসল। চিন্তাকুল ওর দৃষ্টি। আমার দিকে যখন ও চাইল, মনে হল আমার গহনতম হৃদয়ে ও যেন কিছু খুঁজছে! দুজনেই চুপ করে রইলাম। বাইরের জগতের স্তব্ধতা আচ্ছন্ন করে দিল আমাদের অন্তর। ও আমার হাত ধরল; জানি ও কি বলবে। বললও তাই।

"মার্গরিৎ, অহর্নিশি তোমায় আমি স্মরণ করি, আমার জীবন তোমারই হাতে, আমায় আর ফিরিয়ে দিয়ো না মার্গরিৎ, আমার জীবন এ ভাবে ব্যর্থ হতে দিও না; তোমার একটি কথার অপেক্ষায় অধীর

হয়ে আছে আমার সত্তা ; তবু তুমি রাজী হবে না ?"

ওর গলা কাঁপছে, কাঁপছে ওর হাত দুটো। অসম্ভব বিবর্ণ হয়ে উঠেছে ওর মুখ,—আকুল আবেগে ও চেয়ে রইল আমার দিকে। সন্তর্পণে আমার হাত রাখলাম ওর পিঠে ; ওর স্বচ্ছ চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সেখানে অকপট ভালবাসার দীপ্তি।

"হ্যাঁ লুই, তোমায় আমি বরণ করে নেব সাগ্রহে।"—ওর সমস্ত রক্ত যেন ছলকে উঠল সারা মুখে। আমার অতি নিকটে ও সরে এল, তপ্ত দুটি ওষ্ঠ নেমে এল আমার ওষ্ঠে, বহুক্ষণ নিবিড় প্রেমে আমরা মগ্ন রইলাম।

"মার্গরিৎ, তোমায় আমি সারা সত্তা দিয়ে ভালবাসি।" বলে আমায় ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে টেনে নিল। ওর প্রশস্ত বুকে আমার মাথা রেখে অপূর্ব এক সুখের মাঝে নিজেকে নিঃস্ব করে দিলাম। মনে পড়ে, এমনি আনন্দ পেয়েছিলাম আর এক দিন। যখন অনেক দিন আগে এক চাষানীর খোকা জলে পড়ে গিয়েছিল, আর আমি ডুবে যাচ্ছিলাম ওকে উদ্ধার করতে গিয়ে—এমন সময় জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বাবা আমাকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন সবল দুটি হাতে। ঘরের কোন কিছুই চোখে পড়ছিল না ; বাইরে গাছের লম্বা লম্বা ছায়াগুলো দুলছিল। বেশ কিছুক্ষণ নীরবে আমরা কাটিয়ে দিলাম ওই ভাবে। তার পর ওর দিকে মুখ তুলতেই চোখে পড়ল উজ্জ্বল দুটি চোখ ; ওকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলাম, ওর কপালে চুম্বন দিয়ে প্রশ্ন করলাম, "লুই, সত্যি কি তুমি আমায় চাও ?"

আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল ; উত্তরে অনুভব করলাম আরও নিবিড় হয়ে উঠল ওর আলিঙ্গন।

"কিন্তু আমি কি তোমায় সুখী করতে পারব ? সেদিনের মার্গরিতের কঙ্কাল ক'খানা মাত্র আজ বেঁচে আছে, লুই ?"

শীর্ণ আমার হাত দুটো দেখে এক ঝিলিক করুণ হাসি ছড়িয়ে পড়ল আমার মুখে।

"কঙ্কাল থেকেই আবার মার্গরিৎকে আমরা গড়ে তুলব; সেই হবে আমাদের সাধনা।"

বাবা এলেন; উনি কিছু বলার আগেই লুই আমার হাত নিজের হাতে রেখে উঠে দাঁড়াল, বলল, "বাবা, আমরা দুজনে বাগদত্ত; আপনার আশীর্বাদ চাই।"

বাবা এগিয়ে এলেন।

"মা, ভগবান তোদের রক্ষা করুন, তোকে, তোর ঈপ্সিত সঙ্গীকে!" বলে জড়িয়ে ধরলেন আমায়। "আজ সত্যি বড় আনন্দের দিন।"

"সত্যি তুমি সুখী হয়েছ বাবা?"

"হ্যাঁ মা, হ্যাঁ।"

উনি ছুটে গেলেন মাকে ডেকে আনতে। তিনিও এসে আমায় জড়িয়ে ধরলেন, "মার্গো, এ আজ কি শুনলাম মা? সত্যি?"

"হ্যাঁ মা!"

"যাক, ভগবান এত দিনে আমার প্রার্থনা শুনলেন।"

ওঁরা বড় সুখী আজ; আমি ওসুখী; এত আনন্দ পাব কোন দিন ভাবি নি। ভগবানের ইচ্ছেই আমাদের নিয়ে চলুক পথ দেখিয়ে। লুই জানলা টপকে নেমে গেল বাগানে; সেখানে পায়চারি করতে করতে ও ধরাল একটা সিগার।

"তুই সুখী হয়েছিস মার্গরিৎ?"

"হ্যাঁ বাবা।" আমি হাসলাম।

"বেশ মা, বড় স্বস্তি পেলাম; তুই দিন দিন যা শুকিয়ে যাচ্ছিলি, বড় ভাবনায় পড়েছিলাম; এখন তোর সামনে কত কিছু করবার আছে দেখছিস ত? সেই সব কর্তব্যের ডাকে, তাদেরই আশায় তুই এবার সেরে উঠবি দেখিস। ও আর তুই—তোদের দুজনাকে একই রকম ভাবে গড়েছিলেন ভগবান। তুমি কি বল অাঁরিয়েৎ?"

"হ্যাঁ গো, সে কথা আজ আর নতুন করে কি বলি? চল, ওদের

আপন মনে কথাবার্তা বলবার সময় দিতে হবে ; আমরা উঠি।"

"তাই ত, লুই বোধ হয় এতক্ষণ মনে মনে আমাদের মুণ্ডপাত করছে!" উঠে দাঁড়িয়ে বাবা ঠাট্টা করলেন। "তোদের এখন কত কি বলবার আছে, তাই না মামণি?"

আমায় আলিঙ্গন করে মা আর বাবা বেরিয়ে গেলেন। সোফায় আমি শুয়ে পড়লাম ; চেয়ে দেখতে লাগলাম—লুই বাগানে একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। খানিক বাদে, ঘরে কারও গলা শোনা যাচ্ছে না দেখে ও মুখ তুলে তাকাল, তার পর ঘরে কেউ নেই দেখে, সিগারটা ও ফেলে দিয়ে আমার কাছে এসে বসল। পরস্পরের সান্নিধ্যে আমরা স্বপ্নের মধ্যে ভেসে চললাম ; ও আমায় এতও ভালবাসে! খানিক চুপ করে থেকে ও জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, কবে তা হলে ঠিক হল?"

"কি?"

"বাঃ, আমাদের—" ও লাল হয়ে উঠল।

"ওহো ; তা যেদিন তুমি ঠিক করবে।"

"আমি ত চাই এখনই হোক," ও অধীর গলায় জানাল, "আচ্ছা, আগামী তেরোই মে করলে কেমন হয়?"

"বেশ!"

"আরও দুই সপ্তাহ বাকি ; উঃ, এতগুলো দিন! জান, কবে যে তোমায় আমার মত করে পাব,—ভাবতেও ভাল লাগছে!"

"যে লগ্নে তোমায় আমি কথা দিয়েছি তখন থেকেই ত আমি তোমার, একান্তই তোমার, লুই।" আমি উত্তর দিলাম।

ও বড় খুশী হল এ কথায়।

"জান মার্গো, আমি ঠিক করেছি তোমায় নিয়ে সোজা দক্ষিণ দেশে চলে যাব ; এখানে এই কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়ার আওতা থেকে বহু দূরে উষ্ণ কোন প্রদেশে ; সেখানে আমার জীবন-প্রসূন ফিরে পাবে তার পূর্ব-লাবণ্য!"

ওর মধুর কথা শুনে আমার চোখ সজল হয়ে উঠল। এত দুর্বল হয়ে পড়েছি যে অল্পতেই বিচলিত হই আজকাল। ওর শিশুর মত সুন্দর কপালের এলোমেলো চুলগুলি সরিয়ে দিয়ে চেয়ে রইলাম একদৃষ্টিতে।

"কি ভাবছ বল ত ?" ও হাসল।

"ভাবছি যে তোমার মহত্ত্ব আমার প্রকৃতির সঙ্গে কি খাপ খাবে ?"

দু ফোঁটা জল পড়ল ওর হাতে। কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে আমার হৃদয় আজ ভরপুর; আমার মাথা ওর বুকে, ওর মুখ আমার কপালে। জীবনের তরী আজ বন্দর খুঁজে পেয়েছে !

গিয়েছিলাম 'ওর' মাকে দেখতে; ওঁর মাথার অবস্থা খুবই খারাপ। এক দিক দিয়ে এ ভালোই হল! তা নয়ত এত যাতনা সহ্য করা ওঁর পক্ষে দায় হত। কর্ণেল ওঁর কাছেই আছেন। আমায় দেখে কঁতেস চিনতে পারলেন; এগিয়ে এসে আলিঙ্গন করলেন।

"কি তোর চেহারা করেছিস মা !"—এত দিন বাদে ওঁর গলা শুনে বিচলিত হয়ে পড়লাম। বড় কান্না পেল।

"তোর কি অসুখ করেছিল ?"

"হ্যাঁ।"

"ত্যুনোয়া তোর এই চেহারা দেখে যে কি কষ্টই পাবে; ও অল্প দিনের জন্যে বাইরে গিয়েছে; কি একটা কাজে ও গিয়েছে···কোথায় গিয়েছে ?···ওহো! মনে পড়েছে···তুলঁতে! কি নাম-যশহীন জায়গায় যে গেল! কে জানে বাপু, নামটা শুনলেই গা রি রি করে; ওই রকমই। ত্যুনোয়া বাইরে যাওয়া অবধি এমন ভীতু হয়ে উঠেছি। গাস্ত মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যায়। সারারাত এমন সব দুঃস্বপ্ন দেখি যে তারস্বরে চেঁচাই ভয় পেয়ে,—তাই শুনে ও ছুটে আসে।"

ওঁর এই ধরনের এলো-মেলো কথা শুনে বড় কষ্ট হল। এমন সময় কর্ণেল অভিবাদন জানালেন। "কি দিদি, এখন শরীর কেমন ?"

ক'তেসকে উনি জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তর দিলেন না; বসে বসে কি যেন ভাবতে লাগলেন; হঠাৎ আমায় ধরে বসলেন, "কি মা, তোর মুখের হাসি একদম মিলিয়ে গেছে; ব্যাপার কি? তোকে এত গোমড়া দেখছি কেন?"

হাসার ভান করে বললাম, "কই কিছু ত হয় নি।"

"কিন্তু তোর সেই প্রাণোচ্ছল ভাব আর নেই; ওহো, আমিই ত তার কারণ···ভাবিস না মা, ওর ফিরে আসার সময় হল; কই আমি ওর মা হয়েও তোর মত মুখ ভার করে বসে নেই দিন রাত?"

যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম; উনি বিদায়-আলিঙ্গন দিলেন অভ্যাসমত। নিচে কর্ণেলের সঙ্গে করমর্দন করার সময় উনি বলে উঠলেন, "শুনছি মার্গরিৎ, শীগগির তোর বিয়ে? সত্যি না কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"—ওঁর মুখে এ-প্রশ্ন শুনে খুব লজ্জায় পড়লাম; তাই মুখ নামিয়ে নিলাম; উনি আমার চিবুক তুলে ধরে জানতে চাইলেন, "কাপ্তেন লফেভার-এর সঙ্গে, তাই না?"—ফটক অবধি উনি আমায় পৌঁছে দিতে এলেন; বেশ চিন্তামগ্ন লাগল ওঁকে; স্বপ্নোত্থিতের মত বললেন, "তুই কি একা এসেছিস মা?"

"না, বাইরে লুই আমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

আমরা বেরিয়ে আসতেই লুই এগিয়ে এল; করমর্দনের পর ওঁদের কথা শুরু হল। আমার পাশে এসে লুই জিজ্ঞাসা করল, "তুমি ক্লান্ত হয়ে পড় নি ত?"

"না; কিন্তু এখানে খানিক বসে যাই না কেন?"

লুই ভাবল আমার শক্তি ফুরিয়ে এসেছে; একটা ওক গাছের ছায়ায় বসা গেল। কর্ণেল আমার কাছেই বসলেন; বললেন, "এখনও তুই বড় দুর্বল দেখছি।"

লুই জানাল যে আমার খুব অসুখ হয়েছিল।

"হ্যাঁ তা ত জানি।"

"এবার দেখবেন আস্তে আস্তে ও কেমন সেরে ওঠে!" বলে লুই হাসল। অদম্য ওর আশা। ও আমায় একান্তই ভালবাসে। আমি যেন ওর প্রেমের যোগ্য হতে পারি, ভগবান!

কর্ণেল বিশেষ কিছু বলছিলেন না; লুই তা লক্ষ্য করে নি। স্মিত হাস্যে ও আমার দিকে চেয়েছিল—আমাদের অদূরেই যে সুখ-পারাবার, তার স্বপ্নে ও একান্ত। একটু জিরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম; যাবার সময় হল। কর্ণেল বেশ আবেগপূর্ণ ভাবে আমায় বিদায় দিলেন।

"মা আমার, তুই আমাদেব যে সাহায্য করেছিস, তার জন্য ভগবান তাঁর আশীষে তোকে ধন্য করুন, মা!"

তারপর লুইয়ের সঙ্গে করমর্দনের সময় বললেন, "ম সিয়, ওকে সুখী কোর; জীবনসঙ্গিনীরূপে যাকে তুমি পেয়েছ সে যে কত দুর্লভ তা যদি জানতে! তুমি ওকে ভালবাস, বেশ বুঝছি; তার থেকেই বুঝছি ছেলে হিসাবে তুমি কি রকম। জীবনে তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হবে কি না জানি না; তবু এ কথা জেনে রাখ যে বুড়ো এক সৈনিকের শুভেচ্ছা চিরকাল তোমাদের দুজনকে আগলে রাখবে।"

বলেই চলে গেলেন কর্ণেল। আমরা বাড়ি ফিরলাম। বেশ রাত হয়েছে; বাবা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

"এই ত, এসে গেছে!" উনি চেঁচিয়ে উঠলেন।

"মা-মণি, ক্লান্ত লাগছে না ত?'

আদলফ আলো নিয়ে এল।

"তোকে মা বেশ অবসন্ন লাগছে।" বাবা বলে চললেন।

লুই অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। আমি হাসলাম দেখে ওঁরা খানিক নিশ্চিন্ত হলেন।

"তোমাদের চোখে আমি ত আজ-কাল সর্বদাই অবসন্ন হয়ে আছি।" আমি বললাম।

লুই আর বাবা সত্যি আশ্বস্ত হলেন। বাইরের ঘর থেকে আমি

নিজের ঘরে চলে এলাম। পেছন পেছন এল লুই।

"শুনছ?" ও ডাকল। আমি থামতেই ও আমায় জড়িয়ে ধরে কপালে এঁকে দিল স্নেহচুম্বন। আমি ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। পোশাক বদলে ফেললাম; খেতে যাব। ক্রুশের সামনে বসে ভগবানকে স্মরণ করলাম। আমি সবে দাঁড়িয়েছি এমন সময় লুই দরজায় টোকা দিল।

"চলে এস না!"

"আসব?

"বেশ ত! আসবে না কেন?"—দরজা খুলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমায় গোপন করবার মত আমার কি-ই বা আছে?" ও হাসল। ওকে বসিয়ে দিয়ে ওর পাশে আমি বসলাম। বুক আমার টনটন করছে অপূর্ব আনন্দে: প্রার্থনা করছিলাম, লুইয়ের উপযুক্ত সহধর্মিণী যেন হই। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি ওর সারা মুখ তৃপ্তিতে উজ্জ্বল।

"কি ভাবছ গো?"

"কি ভাবছি জান লুই, ভাবছি তোমার ভালবাসার কথা।" বলে ওর হাতে হাত রাখলাম।

"প্রিয়তমা!" ও ডাকল, পকেট থেকে বার করল একটা ছোট্ট বাক্স; তার মধ্যে চমৎকার একটা আংটি; সেটা আমার আঙুলে ও পরিয়ে দিল; মাপে সামান্য বড় ঠেকল যেন।

"তাতে কি, পড়বার ভয় নেই।' আমি বললাম।

কালো রেশমের মত সুন্দর এক গাছা চুল দেখিয়ে ও প্রশ্ন করল, "বল ত কার চুল?

"তোমার মার?"

"উঁহু, তোমার!" ও হেসে বলল।

"কই কবে নিয়েছ, জানি না ত?"

"জানবে কি? তোমার অসুখের সময় নিয়েছি।"

"লুই, আমার সঙ্গে চল না ; পুণ্যময়ী মেরীর কাছে প্রার্থনা করা যাক।"

ও উঠে এল ; বেদীতে গিয়ে ক্রুশের তলায় দুজনে বসলাম হাত ধরাধরি করে। নির্বাক শ্রদ্ধায় ভগবানের কাছে মেলে দিলাম আমাদের হৃদয় ; আমরা যা চাই, তা তিনি দেবেন। আমরা উঠতেই দীর্ঘ আলিঙ্গনে ও আমায় ধরে রাখল। জানলার কাছে তন্ময় ভাবে খানিকক্ষণ কাটিয়ে আমরা খাবার ঘরে গেলাম।

মার আয়োজনের অন্ত নেই। উনি বাবা, কেউই আমায় কুটোটি নাড়তে দেবেন না। গিয়েছিলাম নদীর ধারে, লুইয়ের সঙ্গে। একটা গাছতলায় গিয়ে বসলাম ; পাশেই ঘাসের ওপর লুই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

"কবে যে আমরা এক হব, দিন রাত এই ভাবনাই আমার মাথায় ঘুরছে," বলেই ও সলজ্জ হাসি হাসল।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, "কেন লুই, কাল বাদে পরশু দিন না ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু···" আমার দিকে তাকিয়ে ও বলল, "আচ্ছা, দিনটা পেছিয়ে দিলে হয় না ?"

"না গো, দোহাই তোমার ; তুমি যা বল আমি সবই করতে রাজী আছি ; অমন কথা আর মুখে এন না লক্ষীটি !"

ও আমার হস্ত চুম্বন করল।

এমন সময় পাশের ঝোপটা নড়ে উঠল। দেখি, শ্রীমতী গোসরেল, সঙ্গে একজন ভদ্রলোক,—অবাক হয়ে চেয়ে আছেন। লুই এক লাফে উঠে দাঁড়াল। গোসরেল খিলখিল করে হাসতে লাগল।

"বড় খারাপ সময়ে এসে পড়লাম, না কাপ্তেন সাহেব ?" তারপর আমায় বলল, "তোর বাড়ি গিয়েছিলাম ; তুই শুনলাম বেরিয়ে গেছিস,"

অসভ্যের মত হাসতে হাসতে নিচু গলায় ও বলে ফেলল, "জানতাম কি ছাই কার সঙ্গে কোথায় গিয়েছিস ; তা হলে আর তোদের বাগড়া দিতে আসব কেন ?"

লুই ওর চাবুকটা ঘাসের উপর এলোপাথাড়ি মারতে লাগল অন্যমনস্ক ভাবে ; ওর অধৈর্য ভাব দেখে গোসরেল আমার হাত ধরে সহানুভূতি জানাল, "কি বদলে গেছিস তুই ? একি চেহারা হয়েছে ?"

ওর সঙ্গীর নাম মঁসিয় ভালীন—এই বলে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ও কানে কানে বলল, "বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ; বাপের ব্যবসা আছে ; টাকা-কড়িতে পাকা ইহুদী !"

তারপর সাদা গলায় জিজ্ঞাসা করল, "শরীর খারাপ হয়েছিল বুঝি ?"

"হ্যাঁ।"

"ওঃ, তাই বল ; কিছুই ত জানতাম না। পারী গিয়েছিলাম। তুই কখনও পারী যাস নি, না রে ?"

"একবার গিয়েছি।"

"শুনলেন ত মঁসিয় ভালীন ? বেচারা জীবনে একবারের বেশী পারী যায় নি !"

অমায়িক হাসি হেসে ভদ্রলোক অভিবাদন জানিয়ে আমায় বললেন, "মাদ্‌মোয়াজেল আবার যদি কখনও পারী যান, যা কিছু সেখানে দেখার আছে আপনাকে ঘুরিয়ে দেখানোর ভার আমি নিলাম।"

হঠাৎ বহু কণ্ঠের সাড়া পেলাম ; আমাদের দিকেই যেন এগিয়ে আসছে।

"ওই ত।" গোসরেল চেঁচিয়ে উঠল, "ওরা আসছে ; সিল্‌ভী, এই যে আমরা এখানে।"

তিন জন মহিলা আর দুই ভদ্রলোক হাজির হলেন।

"এই দেখ," একটি মহিলাকে ও ডাকল, "এইটি আমার গাঁয়ের বন্ধু।" তারপর আমায় বলল, "আর এরা আমার পারীসিয়ান বন্ধু : শ্রীমতী

বৃতেভ, শ্রীমতী মারিত, মাদাম কারসা।"

তারপর ভদ্রলোক ছুজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। এত সোরগোল আমার সইছিল না, দারুণ হাঁপিয়ে উঠলাম।

"কাল আমরা সমুদ্রের ধারে একটি প্লেজার ট্রিপে যাচ্ছি রে মার্গরিৎ, তুই আসবি ত?"

"না," আমি জবাব দিলাম।

"কেন, অমন সরাসরি হঠাৎ 'না' বলছিস কেন রে? চল চল, তোকে যেতেই হবে; রাজী ত?"

লুই আমার হয়ে জবাব দিল এবার, "ও অল্পতেই আজকাল বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় না যাওয়াটাই ভাল।"

"বেশ আপনি ওর হয়ে চলুন তবে," ওকে ধরে বসল গোসরেল।

"না মাদমোযাজেল, আমার পক্ষেও যাওয়া সম্ভব হবে না; মাফ করবেন।"

"বেশ, বেশ, কাপ্তেন সাহেব, আপনার রাগ এখনও পড়ে নি দেখছি, তবুও আপনাকে অনুরোধ করছি, যদি আসেন বড় সুখী হব; আসবেন ত? না। ধন্য একরোখা মানুষ বাপু।"

আমাদের সঙ্গে করমর্দনের পর ওরা চলে গেল; দূর থেকে ও দস্তানা-পরা হাত নেড়ে বিদায় জানাল।

আজ সন্ধ্যাবেলায় জানলার ধারে বসে ছিলাম সোফার ওপর; লুই এল। আমার পাশে বসে আমায় এক হাতে জড়িয়ে ধরল; আমি ওর কাঁধে মাথা রাখলাম। ওর পাশে বসে বড় আনন্দ। এই একটি হৃদয় কত যে আন্তরিকতা আর প্রেমে ভরা, আমি জানি। আরও জানি যে জীবনে সব বাধা-বিপত্তির হাত থেকেই ও আমায় আড়াল করে রাখবে। ওর কপোল আমার কপালে, ওর হাত আমার হাতে, আমার মাথা ওর কাঁধের ওপর; আমরা নীরবে এই মুহূর্তটি উপভোগ করছিলাম। কাল

আমাদের দুটি হৃদয় এক হবে। দুই বার ও আমায় চুমু দিল সন্তর্পণে।

লুই যেতেই বাবা এলেন, লুই কোথায় জানতে চাইলেন।

"ওই ত," আমি দেখালাম। লুই পায়চারি করছে। ধূমপানরত। "এইমাত্র ও ত এখানেই ছিল।"

"বল্ মা, তুই সুখী হবি ত?"

ওকে আমি দুই হাত চেপে ধরে বললাম, "হ্যাঁ বাবা।"

উনি তৃপ্ত হলেন।

"লুই তোকে নীস্-এ নিয়ে যেতে চাইছে।"

"হ্যাঁ, আমাকেও বলেছে।"

"তোকে ছেড়ে থাকা বড় কঠিন হবে মা।"

"বাঃ, তোমরা যেন যাবে না আমাদের সঙ্গে, তুমি আর মা?" আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

"আমরা পরে যাব মা। এই ঠাণ্ডা দেশ থেকে তুই যত তাড়াতাড়ি যাস ততই ভাল; দক্ষিণ দেশের হাওয়া পেলেই দেখবি কেমন সেরে উঠিস। বড জোর এক মাস কি দু মাস বাদেই আমরা গিয়ে জুটব। যাবার আগে এখানকার সব কিছু বিলি-ব্যবস্থা করতে হবে ত?"

গত কাল সন্ধ্যার সময় আমাদের পরিণয় সম্পন্ন হয়েছে। পুরুত ঠাকুর যখন ওর হাত আমার হাতে দিলেন, আমি বিহ্বল হয়ে পড়লাম। আমি যেন আদর্শ স্ত্রী হতে পারি। গীর্জা থেকে যখন বের হলাম, আমাদের পথে মুঠো মুঠো ফুল ছড়ানো হল। হঠাৎ একটা গান আমার মনে পড়ে গেল, কোথায় যেন পড়েছিলাম:

"নবোঢ়া রূপসী যে-পথে যাবে,
ফুলে ফুলে দাও সে-পথ ছেয়ে,
পথে পথে ফুল, ফুটনের হাসি,
রূপসী নবোঢ়া এ পথে যাবে।"

গানের শেষটা বড় করুণ :

"পথে পথে ওঠে শোক-ক্রন্দন,
মৃতা রূপসী যে এ-পথে যাবে ;
পথে পথে শোক, অশ্রু-অর্ঘ,
রূপসী মৃতা যে যাবে এ-পথে !"

আমারও কি এই অবস্থা হবে ? ভগবান জানেন। আমাদের মঙ্গলের জন্য তিনি সব করেন।

বাবা আর মা বাড়ির সামনেই আমাদের বরণ করে নিলেন।

চারিদিকে দারুণ ভিড় ; বয়স্করা উচ্চ কণ্ঠে আশীষ জানাচ্ছেন। এঁরা সবাই আমায় অতি ছেলেবেলা থেকে স্নেহ করে আসছেন। লুইয়ের পুরুষালী উদার চেহারা দেখে সবাই বড় সুখী হলেন। বাবা আমায় আলিঙ্গন জানালেন, লুইকেও।

মা দুই হাতে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। ওঁর চোখে জল ; আনন্দাশ্রু। লুই অতি সুখী আজ ; বাইরে থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। মাকে জড়িয়ে ধরল ও।

"বাবা, তোর হাতে আমাদের একমাত্র সন্তানকে সঁপে দিলাম।" উনি বললেন, "জানি তুই ওকে কত ভালবাসিস, আর ও তোর ঘরে গিয়ে আনন্দেই থাকবে। ভগবান তোদের মঙ্গল করুন।"

তেরেস আনন্দের আতিশয্যে আমার গলা আঁকড়ে রইল, "যা দিদি, সুখী হ !"

তারপর বলল, "কিন্তু মাদাম, স্বাস্থ্যটার দিকে একটু নজর দিস, বুঝলি বাছা !"

রাত্তিরে আমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন পুরুতঠাকুর, সপরিবারে মেয়র মশাই, সপরিবারে ডাক্তারবাবু, মাদাম গোসরেল ও তাঁর মেয়ে। নব দম্পতীর স্বাস্থ্যকামনায় পানপর্ব শুরু হল। লুইয়ের মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। শ্রীমতী গোসরেল আমায় উত্ত্যক্ত করে তুলল,—এ কথা ওকে

আমি আগে জানাই নি কেন,—এই বলে।

"তুই ভারি দুষ্টু; এই ত গত পরশু দিন দেখা হল, কানে একবার বলে দিতে কি আপত্তি ছিল?"

"কারণ জানতাম যে তোমাদের ওখানে নিমন্ত্রণ-পত্র পৌঁছে গেছে।"

"আর তাতেই তোর কর্তব্য শেষ হয়ে গেল?"

রাত দুটোর সময় শুতে গেলাম সবার অনুমতি নিয়ে। বড় ক্লান্ত লাগছিল। আমাদের জন্য আমার ঘরটা সাজানো হয়েছিল; পাশের ঘরের দোরটাও খুলে দেওয়া হয়েছে, ওখানে হবে আমার বুদোয়ার। আমার কত দিনের সুখ-দুঃখের স্মৃতিতে ভরা অতি-পরিচিত ঘরটার চেহারা আজ বদলে গেছে; ক্রুশটা শুধু যথাস্থানে আছে। বহুক্ষণ তার সামনে বসে রইলাম।

সকালে উঠতে বেশ দেরি হল। লুই এসে ঘরে ঢুকল, "কি, ঘুম ভাঙল? বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে চেয়ে আছি দেখে ও হেসে বলল, "ওগো বঁধু, তুমি ভুলে গেলে নাকি গত রজনীর কথা?"

'ওগো বঁধু' কথাটায় কি ছিল জানি না, চকিতে চেয়ে দেখি সামনেই 'আমার স্বামী'। বড অপরূপ ওর চেহারা; আমার দুই কাঁধে হাত রেখে ও স্মিতমুখে চেয়ে ছিল। অসীম প্রেমে ভরা ওর চোখ আজ স্নেহনম্র; ধবধবে সাদা দাঁতগুলো উঁকি দিচ্ছে সরল হাসিতে উজ্জ্বল ওর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে, ওর ঢেউ-খেলানো চুলে সোনা আর পান্নার চমক। ওর গলা জড়িয়ে ধরে আমি ওর ঠোঁটের ওপর রাখলাম আমার ঠোঁট। ও বসে পড়ল আমার পাশে, আমি ওর বুকে মুখ লুকালাম, আমার কপাল থেকে ও চুলগুলো আস্তে আস্তে সরিয়ে দিল; ওর কাছাকাছি আরও নিবিড় হয়ে বসলাম, তাকালাম ওর দিকে সহাস্য, নির্ভরশীল দৃষ্টিতে। ও আমার স্বামী, বন্ধু! ভগবানকে ধন্যবাদ জানালাম আমায় এত সহৃদয়, প্রেমাতুর, অনুগত স্বামীর হাতে অর্পণ করার জন্য। এক সঙ্গে গিয়ে ক্রুশের সামনে আমরা প্রার্থনা করলাম।

ও নিচে গেল ; আমি খানিক বাদে যখন নামছি সিঁড়ি দিয়ে, ও দেখি আবার ওপরে আসছে।

'কি হল ?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'কিছু না, আমার ঘড়িটা তুলে এসেছি,' বলে টুক করে আমায় জড়িয়ে ধরল।

ঘরে গিয়ে ও দরজাটা একটু ফাঁক করে রাখল। চার-তলার ঘর থেকে তেরেস নামছিল।

"এই যে দিদি, ঘুম ভেঙেছে ?" ও আহ্লাদে ডগমগ করে উঠল, "এই ত ! কেমন সুন্দর চড়ুয়ের মত স্ফূর্তিভরা চেহারা হয়েছে তোর। এখনও অল্প ফ্যাকাশে ভাব যদিও আছে। কেমন দিদি, আগেই বলি নি এবার শীগগির তুই সেরে উঠবি ?"

আমি হাসলাম। লুই ঘর থেকে বেরিয়ে এল, "কি বলছ, ও তেরেস ?"

"কাপ্তেন সাহেব, বলছিলাম যে মাদমোয়াজেল আপনার রাজত্বে যেতে না যেতেই ওর গালের গোলাপগুলো আবার ফুটেছে।"

লুই হেসে বাধা দিল, "না তেরেস, ও আর এখন মাদমোয়াজেল নয়।"

"তাই ত ! আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে !" বলে ও কপাল চাপড়াতে লাগল, "এবার থেকে ত ওকে মাদাম বলে ডাকতে হবে। খুকীদির বে হয়ে গেছে, ভাবতেও কেমন লাগে। না, আমার ভীমরতি ধরেছে।"

লুই হাসল। আমরা খাবার ঘরে গেলাম। বাবা "কেমন আছিস ?" বলে আমায় চুমা দিলেন। মা মৃদু মৃদু হাসছিলেন ; টেবিলের ওপর একটা চিঠি আর বাক্সের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

"আমার জন্য ?"

"হ্যাঁ মার্গো, তোর ঠাকুরমা পাঠিয়েছেন," মা জানালেন।

নানা রকম দামী পাথরের কাজ-করা সুন্দর দুটি সোনার ব্রেসলেট

ছিল বাক্সের মধ্যে।

"আমাকে কি এত সুন্দর গয়নায় মানাবে?"

"দেখাই যাক না, পর ত," বলল লুই।

"উঁহু, আগে ওঁর চিঠিটা পড়া যাক্।"

চিঠিটা আন্তরিক স্নেহে উচ্ছল। আমাদের বিয়ের যৌতুক স্বরূপ গয়না পাঠিয়েছেন ঠাকুমা, আর লিখেছেন পারী গিয়ে ওঁকে আমরা যেন দেখে আসি একবার।

ও আর আমি বেড়াতে গেলাম। একটা চেরিগাছের ছায়ায় ঘাসের ওপর বসা গেল। আমার কোলে মাথা রেখে লুই শুয়ে পড়ল।

একটু সঙ্কোচের স্বরে ওকে বললাম, "লুই, তোমার মায়ের কথা বল না?"

ও চুপ করে আছে দেখে ভাবলাম বুঝি এ প্রশ্ন ওর মনঃপূত হয় নি।

"লুই, রাগ করলে?"

আমায় আদর করে ও বলল, "কি যে বলছ, রাগ করব, তোমার ওপর? কেন বল ত? ভাবছিলাম মা যদি আজ বেঁচে থাকতেন তবে আমার প্রাণাধিকাকে দেখে কি তৃপ্তিই না পেতেন! হয়ত উনি অদৃশ্য-লোক থেকে আমাদের দেখছেন, আমাদের ওপর ঝরে পড়ছে ওঁর আশীষধারা।"

"ওঁর ছবি তোমার কাছে আছে?"

"এখানে নেই; বাড়ি গিয়ে তোমায় দেখাব। আমার সঙ্গে আছে কয়েকগুলি চুল।" বলে ওর ঘড়ির চেনে লাগানো একটা লকেট খুলে দুই গুছি চুল দেখাল।

"তুষার-শুভ্র গুছিটি আমার মায়ের; কটা চুলগুলো আমার বাবার।"

"তোমার মার গায়ের রং বুঝি এত সুন্দর ছিল?"

"হ্যাঁ, ওঁকে অতি অপূর্ব দেখতে ছিল; আমায় দেখলে অবশ্য উলটো

ধারণাই হবে", ও হেসে বলল।

আমি ওর মুখ চেপে ধরলাম।

"বাবার সঙ্গে ওঁর মিলন হয় অতি অল্প বয়সে, তবে তোমার মত এত কম বয়সে নয়।"

কাল আমরা চলে যাব। আজ সবই তাই থম্‌থম্‌ করছে। লুই আর বাবা দেখাতে চাইছিলেন ওঁদের স্ফূর্তিতে ভাঁটা পড়ে নি, কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছিল বাবা খামকা এই অপচেষ্টা করছেন। মা আর আমি সেলাই করছিলাম। মার কত যে কষ্ট হচ্ছে! তা সত্ত্বেও উনি জোর করে আমাদের পাঠাচ্ছেন—আমার শরীরের কথা ভেবে।

"তোর যা স্বাস্থ্যের অবস্থা; অবিলম্বে চেঞ্জে যাওয়া দরকার। সঙ্গে তোর স্বামী থাকবে, আমার ভাবনার কি-ই বা কারণ আছে?"—আমায় উনি উৎসাহ দিচ্ছিলেন এই বলে।

বাবাও বললেন যে, অল্পদিন বাদেই মা আর উনি আমাদের সঙ্গে নীসে মিলিত হবেন। আমার চোখের জল দেখলে পাছে ওঁরা দুর্বল হয়ে পড়েন, তাই আমি প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলাচ্ছিলাম। আমরা বিকেল ছটার এক্সপ্রেসে রওনা হব।

আমার ঘরে গিয়ে একা বসে কাঁদছিলাম; এই বাড়ি ছেড়ে, বাবা-মাকে ছেড়ে এক মাসও আমার পক্ষে কোথাও থাকা অসম্ভব। তেরেস এল।

"সে কি খুকুদি, কাঁদছিস কেন? কাপ্তেন সাহেব দেখলে কি ভাববে বল্‌ ত? তোর এই অবস্থা দেখলে ওর কত কষ্ট হবে বল্‌ দেখি? ও বউ! স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে যাবি, এতে কাঁদবার কি পেলি!"

জল এনে ও আমার চোখ-মুখ ভাল করে ধুয়ে দিল। ও ঠিকই বলেছে। লুই বেচারা আমায় এত বিচলিত দেখলে কোন্‌ প্রাণে যাবার ব্যবস্থা করবে? মা এসে আমায় দেখে কেঁদে ফেললেন। তারপর

আমার স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিলেন। দশটা অবধি আমার কাছে উনি রইলেন। লুই এলে হাত ধরে ওকে পাশে বসালেন।

"বাবা," ওকে মা বললেন, "তোর হাতে এই দুখের বাছাকে সঁপে দিয়েছি,—জানি যে তুই ওকে সুখে রাখবি; লুই, ওকে সর্বদা চোখে চোখে রাখবি ত? দেখছিস ত এখনও ও নাবালিকা, তা ছাড়া কত দুর্বল!"

"হ্যাঁ মা," ও প্রতিশ্রুতি দিল। মিনিট পনেরো আলোচনার পর মা উঠলেন।

পারী।—কাল বিকেলে বৃটানি ছেড়ে এসেছি; রাত দুপুরে এখানে পৌঁছেছি। মা আর বাবাকে বিদায় জানাতে গিয়ে নিজেকে সামলাতে পারি নি; ওঁরা স্টেশন অবধি এসেছিলেন। আমায় সজোরে বুকে ধরে শত চুমায় বাবা অভিষিক্ত করলেন। বাবার কণ্ঠলগ্ন হয়ে আমি অঝোরে কাঁদলাম।

কাঁপা গলায় উনি বললেন, "যা মা, আর কাঁদিস না,—বড় কষ্ট লাগছে আমার।" তারপর হাসার চেষ্টা করে বললেন—"তা ছাড়া তরুণ-তরুণীর সংসারে আমাদের মত বুড়ো হাবড়ার কি-ই বা দরকার বল্ ত?"—মা লুইকে আশীর্বাদ করলেন।

"ওকে দেখিস কিন্তু বাবা", মার অনুরোধ ভেসে এল। বাবার হাত ধরে আমাদের কামরা অবধি ও এল। আবার আলিঙ্গন-আশীর্বাদের পালা শুরু হতেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

যতক্ষণ পারলাম চোখ ভরে চেয়ে রইলাম মা-বাবার দিকে; আমাদের গ্রামের দিকে চোখ পড়ল। মিলিয়ে যাবার পূর্বক্ষণ অবধি আমি সমস্ত অনুভূতি দিয়ে উপভোগ করতে লাগলাম আমাদের গ্রামের শোভা। বুকের কাছটা খালি খালি লাগল। আমার স্বামীর দিকে তাকালাম। ওর জন্য আজ সব কিছু ছেড়ে এলাম, বাবা, মা, দেশ,

অতীত। ওর স্বচ্ছ স্নেহ-কোমল চোখের দিকে চেয়ে আমার মধ্যে জেগে উঠল ক্ষীণ এক আশার শিখা, সুখময় এক ভবিষ্যতের স্বপ্ন। ওর কাঁধে ভর দিয়ে, হাতে হাত রেখে নীরবে কাঁদতে লাগলাম। ও আমায় ওর স্নেহচ্ছায়ায় ঘিরে ধরল। আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এলাম; মুখ তুলে তাকালাম ওর দিকে।

"তোমায় বড বিরক্ত করছি, না গো?" ওকে প্রশ্ন করলাম।

"আমায়? বিরক্ত করছ?" ও হেসে জিজ্ঞাসা করল, "আমি কিছুতে বিবক্ত হই? বল মার্গবিৎ?"

গাড়ির আলো জ্বলে উঠল। আমাদের কামবায দেখি আরো এক জন বয়স্ক ভদ্রলোক আছেন; বেশ মন দিয়ে উনি আমাদের লক্ষ্য করছিলেন। বড় অস্বস্তি লাগল: উনি নিশ্চয় আমায় কাঁদতে দেখেছেন; লুইকে চোখের ইশারায় প্রশ্ন করলাম—ভদ্রলোককে ও প্রথমেই দেখেছিল কি না। ও সম্মতিসূচক হাসি হাসল, আর আমায় আগের মত ভাবেই বসতে বাধ্য করল। তার পর আস্তে আস্তে গল্প-গুজবে মেতে উঠলাম। একটু নীববতাব সুযোগ নিয়ে ভদ্রলোক কথা পাড়লেন।

"মশাইয়ের কি পারী যাওয়া হচ্ছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দু-এক দিনের জন্য; কয়েক মাস আমরা গিয়ে দক্ষিণদেশে কাটাব ইচ্ছে আছে।"

"আমিও পারী যাচ্ছি; ডাক্তারি করি: নাম আমার ডাঃ লাফের্‌ম্, আপনাদের কোন উপকার করতে পারলে কৃতার্থ হব; আপনার ত দেখছি সামরিক বিভাগের চাকরি।"

"আজ্ঞে, আমি হচ্ছি দ্বাবিংশ অশ্বারোহী বাহিনীর কাপ্তেন লফেভার।" —লুই নিজের পরিচয় দিল।

"মাদামের কি শরীর খারাপ লাগছে?" সৌজন্যের সঙ্গে ভদ্রলোক জানতে চাইলেন।

"সম্প্রতি উনি অসুখ থেকে উঠেছেন।" লুই উত্তর দিল।

উদ্বিগ্ন নয়নে লুই আমার দিকে তাকাল ; ভদ্রলোকের প্রশ্নে ও ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমায় জিজ্ঞাসা করল, শরীর খারাপ লাগছে কি না।

"না গো না, আমি আজ খাসা আছি।"

ও আশ্বস্ত হল।

আমরা লুভর্ হোটেলে উঠেছি। এখন ভোর ছটা। বাড়িতে আমি বরাবরই সকাল সকাল উঠতাম। সে অভ্যাস এখনো ছাড়ি নি। গ্রামের কথা, বাবার কথা, মার কথা মনে পড়তেই চোখ আমার জলে ভরে ওঠে তবু আমি সুখী, বড়ই সুখী। লুই এখনও ঘুমুচ্ছে। আমি চাই না ও দেখুক আমি কাঁদছি। মনে হচ্ছে কত দিন হল আমি চলে এসেছি ; এই ত সবে গতকাল আমরা বাড়ি থেকে রওনা হলাম। আজ ঠাকুমার ওখানে যাব। উনি বোধ হয় জানেন না আমাদের আসার কথা, আমাদের পেলে কি খুশীটাই হবেন উনি! বড় জোর দু দিন কি তিন দিন আমরা এখানে থাকব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লুই দক্ষিণ দেশে পৌঁছুতে চায়। আজ আমি ভগিনী ভেরোনিকের দেওয়া ক্রুশটার সামনে বসে প্রার্থনা করলাম। ওটি সর্বদাই আমার গলায় থাকে। বেচারি! কত অল্প বয়সেই না মারা গেলেন। ওঁর জীবনের ছাব্বিশটা বছর খতিযে দেখলে দুঃখের পুঁজিই বেশী দেখা যাবে। আজ উনি শান্তিলোকের অধিবাসী। Requiescat in peace!

লুইয়ের ঘুম ভাঙল। "কি গো, বড় দেরি হয়ে গেল না?" বলে ও আমায় জড়িয়ে ধরল। এবার লেখা থামাই। সারা দিনের জল্পনা-কল্পনা ও এখন সেরে রাখতে চায়।

আমরা ঠাকুমার ওখানে গিয়েছিলাম। আমরা এসেছি, চাকরের মুখে শুনে উনি সোজা বাইরের দরজায় গিয়ে হাজির।

"আয় রে আয় বাছারা!" আনন্দে ওঁর গলা ভারী হয়ে উঠল। আমরা বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলাম, উনি আমাদের হাত ধরে বলে

চললেন—"কি দাদা-দিদি, তোরা সুখী হয়েছিস ত ?"

"হ্যাঁ" : আমাকে যেমন প্রশ্ন !

"কিন্তু তোর এমন রক্তহীন চেহারা কেন রে দিদি ? খুব ভুগলি বুঝি ? বাছা আমার ! বাবা-মার সব খবর কি ? ভাল ত ?"

লুইকে বসিয়ে আমায় নিয়ে গেলেন সোফার কাছে, "নে দিদি, একটু জিরিয়ে নে ; খুব কাহিল হয়ে পড়েছিস, তাই না ?"

"না ঠাকুমা, এইটুকুতেই কাহিল হব ? এখন আমার বল ফিরে এসেছে, শরীরের অবসাদ কেটে গেছে।"

লুইয়ের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, "তাই নাকি রে লুই ? বেশ, তা হলে আজ আমার এখানে খেয়ে দেখাতে হবে কেমন শরীর সেরেছে। কোনও ওজর শুনছি নে বাপু ! আমার কথা শুনতে হবে।"

ওঁর পাঠানো উপহারের জন্য ধন্যবাদ জানতে গেলাম : উনি থামিয়ে দিলেন আমায়।—"ও-সব কিছু আমি শুনতে নারাজ। দু জনে আজ এখানে খেয়ে যাও, তবেই ব্রেসলেটের দাম উঠে যাবে।"—ওঁর কথায় রাজী হতেই হল। আমাদের ছেলেবেলার কত গল্পই যে করলেন।

"জানতাম, তোরা একদিন মিলিত হবিই ! বুঝলি দিদি, প্রথম দর্শনেই তোদের প্রেম হয়, সে কথা আমার এখনও মনে আছে। ওর জন্মদিনে সে বার ওর সাত বছর পূর্ণ হল। তোর তখন বছর দুয়েক বয়েস। ছোটদের জন্য একটা 'বল' নাচের ব্যবস্থা হয়েছিল। দুই থেকে বারো বছর বয়সের নানা ছেলে-পিলেতে ঘর ভরতি। লুইয়ের হাতে ছোট একটা মালা,—ওর হৃদয়-রাণীর গলায় পরিয়ে দেবে। কত রূপের, কত বর্ণের খুকীই যে ওর সামনে দিয়ে আনাগোনা করল : কিন্তু মহারাজের মন কিছুতেই ভরল না। সেই সময় তোকে কোলে নিয়ে তোর মা ঘরে ঢুকলেন। সেই তোদের প্রথম দেখা। সাদা-পোশাকে আবলুসের মত চুলে আর কুচকুচে কালো বড় বড় চোখে কি রূপই সেদিন খুলেছিল তোর ! ওর আর তর সইল না ; সটান গিয়ে তোর মাথায়

মালাটা দিয়েই এক চুমু। কি হাসির রোল যে উঠল দিদি! ছোঁড়ার মা ত কাঁদবে কি হাসবে ভেবে সারা। তার পর তোকে কোলে তুলে নিয়ে জানতে চাইল ওর মা,—তুই তার ছেলের বউ হবি কিনা। খুব গম্ভীর গলায় দৃঢ়তার সঙ্গে তুই জবাব দিয়েছিলি—'হুঁ।'—ওর মা অতি মহানুভব প্রাণোচ্ছল মেয়ে ছিল; বেচারী আজ তোদের দেখলে কি তৃপ্তিটাই না পেত।"—বলে ঠাকুমা চোখ মুছলেন। লুই আমার হাতে চাপ দিল; আমাদের চোখাচোখি হল।

ছয় মাস হয়ে গেল আমরা নীসে সংসার পেতেছি। সমুদ্রের ধারে ছোট্ট এই শহরটি বড় ভাল লাগে। কত দিন যে আমার খাতায় কিছু লেখা হয় নি; সময় পাই না একদম। ওর হুকুম, যতক্ষণ সম্ভব খোলা হাওয়ায় থাকতে হবে; আর সন্ধ্যাবেলা ত প্রায়ই আটটার আগে ঘুমুতে হয়। এত তাড়াতাড়ি যে ঘুমিয়ে পড়ি, এর থেকেই বুঝছি আমি সেরে উঠছি। ভূমধ্যসাগরের বেলাভূমিতে দুজনে যখন-তখন ঘুরতে যাই। সূর্যের আলোয় নীল সাগরের বুকে অজস্র রঙের বাহার দেখে চোখ ঝলসে ওঠে। রাতের খাওয়া প্রায়ই ছাতের ওপর হয়। সেখান থেকে জ্যোৎস্না রাতের সমুদ্র যে কী অপূর্ব লাগে! দুজনে দুজনকে নতুন করে পাই এই অসীম রূপের পাথারে। কখনও কখনও এভাবেই ঘুমিয়ে পড়ি; সবল দুটি হাতে ও অবলীলাক্রমে আমায় বুকে তুলে নেয়, শুইয়ে দেয় গিয়ে বিছানায়; এত যে চেষ্টা করি জেগে থাকতে, তবু পারি না। ও বলে, এতে ওর বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না; আমার ওজন নাকি ওর কাঁধের পেশীটার চেয়েও কম! আমার লুই যে কত ভাল তা কি করে বলি? ওকে ভালবেসে, ওর জীবনসাথী হয়ে নিজেকে আমি ধন্য মেনেছি।

মা কিংবা বাবার পাত্তা নেই এ অবধি। ওঁরা চিঠি অবশ্য প্রায়ই লেখেন। এবার লিখেছেন আসছে মাসের আগে আসতে পারবেন

না ; এত আশা করেছিলাম যে আগস্ট মাসের আগেই ওঁদের সঙ্গে দেখা হবে।

লুইকে মাঝে মাঝে পারী যেতে হয় ; ওখানেই ওর রেজিমেণ্ট আছে এখন। বড জোর দু দিনের বেশী ও বাইরে কাটায় না। গতকাল সকালে ও পারী গিয়েছে ; আজ বিকেলে এসে পৌঁছবে লিখেছে। বারণ করেছে গতবারের মত স্টেশনে যেন না যাই ওকে আনতে। ওর ধারণা এত অল্পেই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়বো। তবে, বাগানের দরজা অবধি গিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করতে পারি, এ অনুমতি ও দিয়েছে! ওকে একটা কথা বলতে হবে,—এমন কথা যে ভাবতেই প্রতিবার আমি আশায়, আনন্দে শিউরে উঠছি! ভগবান, অসীম তোমার করুণা!

ছটা বাজল, আধ ঘণ্টার মধ্যেই লুই এসে পড়বে! এবার খাতা বন্ধ করি, বাগানে গিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করব।

কাল লুইকে কথাটা বলেছি। রাতে খাবার পর আমরা ছাতেই ছিলাম। পারীতে কি দেখল, কি করল—সব কিছু সবিস্তারে বলছিল ও। খানিক চুপ করে থাকার পর ওর বুকে মুখ রেখে বললাম—"লুই, আমার মনে হয়…" রাজ্যের লজ্জা এসে জড়ো হল আমার সর্বাঙ্গে, "মনে হয় যে শীগগির আমাদের ঘরে নতুন এক অতিথি আসছে।"

উল্লসিত ওর ওষ্ঠের সঙ্গে আমার ওষ্ঠ এক হয়ে গেল। কাল থেকে আমার চোখে জগতের রূপ পালটে গেছে, আমার সুখে মনে হল বিশ্বপ্রকৃতি আজ সুখী। আমার জানলার পাশে গোলাপ গাছের ওপর থেকে পাখীরা মধুর কি এক বাণী নিয়ে আসে আমার জন্য ; ওদের চঞ্চল চোখ যেন আমারই সুখের প্রতিচ্ছবি। ফুল ফুটে উঠেছে অপূর্ব প্রাচুর্য নিয়ে ; সমুদ্রের ধারে যখন বসি আর ঢেউগুলো এসে লুটিয়ে পড়ে আমার পায়ের তলায়, মনে হয় ওরা বন্দনা গাইছে নবাগতের। ভগবান, তোমাকে আমার প্রণতি জানাই। আজ সকালে ঘুম ভাঙতেই বসে রইলাম

লুইয়ের পাশে, চেয়ে রইলাম ওর ঘুমন্ত মুখের পানে ; ওকে আমি বড় ভালবাসি ; আমার স্বামী, আমার সন্তানের পিতা ! দশ মাসও হয় নি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম তোমার প্রস্তাব। তা সত্ত্বেও তুমি আমায় ভালবেসেছ বন্ধু, বড়ই অকৃতজ্ঞ, বড়ই নিষ্ঠুর আমি। কিন্তু না, আজ, লুই, প্রিয়, তোমায় আমি প্রাণাধিক ভালবাসি ; মনে পড়ে তোমার মুখে প্রথম যখন এ-কথা শুনি চেরি-বাগানে। ওর কপালে আলতো ভাবে চুমা দিয়ে আমি জানলা খুলে দিলাম। প্রাণোচ্ছল আলোর স্রোতে ঘর ভরে গেল। সূর্যের প্রোজ্জ্বল মুখখানি হেসে যেন আমায় বলছে, "সুপ্রভাত।" পাখীদের মুখেও সেই কথার প্রতিধ্বনি, "সুপ্রভাত।" আনন্দেব আবেগে আমার ইচ্ছে হল গলা ছেড়ে চিৎকার করে উঠি। গোলাপ তুলতে গিয়ে মৃদুস্বরে তাদের জানালাম এ-সুখবর। শিশিরভেজা ফুলগুলো নিয়ে গিয়ে রাখলাম মেরী-মায়ের বেদীমূলে ; আমাদের আশার অকপট অঞ্জলি ওঁর চরণে কি পৌঁছবে না? কতক্ষণ জানি না, চেয়ে রইলাম ওঁর অঙ্কশায়ী নবজাত যীশুর দিকে ; এই দেবশিশুর মত সুন্দর হোক আমার সন্তান। আকুল প্রাণে প্রার্থনা করলাম যীশুর কাছে। তার পর মেরীকে স্মরণ করে বললাম, "হে জননি! আমাদের ঈশ্বরের জননি, আমায় বল দাও, আমার সন্তানকে পরম প্রভুর ইচ্ছা অনুযায়ী আমি যেন গড়ে তুলতে পারি আদর্শ মানুষ রূপে!"

কাল আমরা ছাতের পাশে হলঘরটায় বসে ছিলাম। একটা কৌচের ওপরে বসে লুই আর আমি আমাদের সন্তান সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করছিলাম। আমি বললাম, "লুই, তোমার মত ও সৈন্য-বিভাগে কাজ করবে, না?"

"যদি ওর মায়ের আপত্তি না থাকে," ও হেসে বলল।

"আমার ত একান্ত ইচ্ছে যে ও হুবহু তোমার মত হোক ; লোকে দ্বিতীয় লুই লফেভার বলে ওকে অভিহিত করুক। তোমারই রেজিমেন্টে ও যোগ দেবে,—বাপের অধীনে কাজ করবে। আর আমি হাবিলে

অশ্বারোহী বিভাগের আমার স্বামী ও পুত্র সম্বন্ধে সেদিন গর্ব করে বেড়াব। তার পর ও যখন একুশ বছরে পা দেবে, তোমার বদলে ও হবে কাপ্তেন, আর তুমি, তুমি হবে মার্শাল।"

"সমস্ত ফরাসী সৈন্যবিভাগের মার্শাল, না?"

"নিশ্চয়ই! তোমার কি সাহসের অভাব?—তখন তুমিই ওকে অস্ত্রশিক্ষা দেবে। ওর প্রথম বিজয় যেদিন ঘোষিত হবে, সেদিন সবাই অবাক হয়ে তাকাবে ওর দিকে, 'কে এই তরুণ যোদ্ধা!' লোকে তখন বুক ফুলিয়ে উত্তর দেবে, 'মার্শাল লফেতার-এর ছেলে?' আর আমি মনে মনে বলব, 'আমাদের সন্তান'!"

কাল লুই আর আমি বনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। খানিক এদিক ওদিক ঘোরবার পর আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় গেলাম; অলিভ গাছের ছায়ায় গজিয়েছে অজস্র নরম 'মস্'। বুনো গোলাপের বেড়া দেওয়া ছোট্ট এই কুটিরখানা প্রকৃতি যেন আমাদের জন্য তৈরী করেছিলেন। তার গোপনতম কোণে গিয়ে আমি বসলাম, আর চিরদিনের অভ্যাসমত লুই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল আমার কোলে মাথা রেখে। আমার দিকে নীরবে চেয়ে ও নাড়াচাড়া করছিল আমার গলার লকেটটা। এই লকেটের মধ্যে আমি ওর ছবি রেখে দিয়েছি।

"শুনছ? বড় ঘুম পাচ্ছে।"

ওর দিকে তাকালাম, কি অপরূপ দেখতে! আমার সাদা মসলিনের পোশাকের ওপর ওর কটা রঙের চুলগুলো চমৎকার লাগছে। ওর বাঁ হাতে লকেটটা রয়েছে, ডান হাতটা আলতো ভাবে নামানো মাটির ওপর।

ও হঠাৎ চোখ খুলে আমায় জিজ্ঞাসা করল, "কি এত ভাবছ গো?"

"আমাদের সন্তান যেন তার বাপের রূপ পায়, লুই।"

"আমায় যদি অতই সুন্দর দেখতে তবে তার দাম চাই, একটা—" ও হেসে বলা মাত্র আমি নিচু হলাম; ও সাগ্রহে আমার গলা জড়িয়ে ধরল।

"মার্গরিৎ, মার্গো, তোমায় বড় ভালবাসি !"

হঠাৎ মনে হল কে যেন ঝোপের ওদিকে রয়েছে, লুই ঘাড় ফিরিয়েই দেখল, একটি লোক এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের সামনে। লুই উঠে দাঁড়াল চট করে।

"ভিযার ! তুই এখানে কি করে এলি রে ?" সানন্দে ও চেঁচিয়ে উঠল।

"আমার ভ্রমণের নেশার কথা জানিস্ ত ? আর এখানেই দিন কাটাচ্ছি কেন জানিস ? তোকে আর তোর বউকে দেখব বলে।" আগন্তুক উত্তর দিয়ে আমায় অভিবাদন জানাল।

"এখানে দিন কাটাচ্ছিস কি রে ? এত দিন এখানে আছি, তোর সঙ্গে দেখা হয় নি ত ?"

"সে কথা থাক, তোদের দুটিতে এত চমৎকার 'তাবলো'র সৃষ্টি করেছিলি রে ! চুপি চুপি ক্যানভাসের বুকে এঁকে নিলাম। আমার ওপর সেজন্য রাগ করলি না ত, লুই ?"

"রাগব কেন রে ? তোর হাজার খুন মাফ করলাম ; ক্যানভাসের ওপর ছবি হয়ে টিঁকে থাকার বদলে পুরুষালি একটা কাজ দিলি বটে !"

আমার দিকে ঘুরে ও বলল, "মাদাম, আমায় মাফ করবেন ত ?"

"বিলক্ষণ মঁসিয়, অবশ্য এতে মাফ করার কিছুই দেখি না !" আমি জবাব দিলাম।

"ধন্যবাদ মাদাম, আপনি দেখছি সাক্ষাৎ করুণাময়ী !"

"কিন্তু তোর ছবিটা লুকোলি কোথায় ভিয়ার ?" লুই প্রশ্ন করল।

"উঁহু, এখন দেখাচ্ছি না ; শেষ আঁচড় দেওয়ার পর দেখবি ; এখন খালি কাঠামোটা দাঁড় করিয়েছি।"

"তবে চল্, আমাদের ওখানেই এ-বেলার পাট চুকিয়ে নিবি !"

"আমি ত এক্ষুনি রাজী, কিন্তু মাদাম কি আমার মত ভবঘুরেকে

বাড়ি ঢুকতে দেবেন ?"

"নে নে, ও-সব পারিসিয়ান নকুতো এখানে অচল," লুই ধমক দিল হেসে। আমিও যোগ দিলাম, "বুঝলেন মঁসিয়, লুইয়ের যত বন্ধু আছেন, প্রত্যেকেই আমারও বন্ধু,—তাঁরা প্রত্যেকেই যে-কোন মুহূর্তে আমাদের বাড়ি আসতে পারেন ; কাজেই কোন ওজর খাটবে না মশাই !"

বাড়ির পথ ধরলাম আমরা।

"তুই বিয়ে করলি লফেভার, আমাকে জানাস নি ত ?"

"হুঁ, বহুকাল তোর সঙ্গে দেখাও হয নি, তোকে লেখাও হয় নি, গেল মে মাসে আমাদের বিয়ে হল।"

"আর আমায় একটা লাইন পর্যন্ত লিখে পাঠালি না হতভাগা ! দেখলেন ত মাদাম, কেমন বন্ধু ?" আমায় ও সাক্ষী মানল। তার পর কিছু গম্ভীর কিছু পরিহাসের সুরে ও বলে চলল, "থাক বাপু, তোকে আর বেশী উত্ত্যক্ত করব না। কারণ বিয়ের পর, বিশেষতঃ মাদামের মত রূপে গুণে তিলোত্তমার হাতে পড়লে, লোকে আর সবই ভুলে যায়।"

লুই ওর বন্ধুর কাঁধে হাত রাখল।

"সত্যি ভিয়ার, তুই বড় একটা সত্যি কথা বলে ফেললি ; জীবনে আমি এত সুখ আশা করি নি !"—কাঁপা গলায় লুই বলল। ওর চোখ ঝাপসা হয়ে এল ; ওর বন্ধু সহানুভূতির সুরে জানাল—"জানি লফেভার, জানি ; তোর এই সুখের যে আমি কত বড় সমভোগী তা, তা তুই জানিস না।" লুইয়ের হাত ধরল ও।

খাবার পর লুই মঁসিয় ভিয়ারকে গান গাইতে বলল। "জান মার্গারিৎ, খোদ মারিও-র মত ওর গলা।" আমিও অনুরোধ করাতে মঁসিয় ভিয়ার গিয়ে পিয়ানোয় বসল। জানলার কাছে একটা কেদারায় গিয়ে বসল লুই। ওর পাশেই একটা গদিতে বসলাম আমি, ওর কোলে

মাথা রেখে। ভিয়ারের প্রথম কয়েকটি সঙ্গত শুনেই কেমন একটা অস্পষ্ট স্মৃতি চকিতে জেগে উঠল। জানা একটা সুর, কিন্তু ঠিক মনে করতে পারলাম না কি! ও হো, এইবার মনে পড়েছে।

"নবোঢ়া রূপসী যে পথে যাবে,
ফুলে ফুলে দাও সে-পথ ছেয়ে;
পথে পথে ফুল, ফুটনের হাসি,
রূপসী নবোঢা এ-পথে যাবে!"

এ যে জাস্‌ম্যাঁর সেই করুণ গান। আমাদের বিয়ের দিন হঠাৎ যে গানটা আমার মনে পড়েছিল। দু'দুবার একই গান এ-ভাবে আমার কানে ধ্বনিত হল,—এ কি কিছুর ইঙ্গিত? ওই ত! শেষটুকু ও গাইছে, সুন্দরী এয়োস্ত্রীকে কবরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে:—

"পথে পথে ওঠে শোক ক্রন্দন
মৃতা রূপসী যে এ পথে যাবে;
পথে পথে শোক, অশ্রু-অর্ঘ,
রূপসী মৃতা যে যাবে এ পথে।"

আমার বুক ব্যথায় টন টন করতে লাগল। সজোরে লুইয়েব হাত চেপে ধরলাম। ও সুখী, ভগবান; আমি, আমিও সুখী! আর কোল জুড়ে যে আসছে! ওকে বুকের দুধ খাইয়ে কি জীবনের পথে দীক্ষিত করে যেতে পারব না আমি? দয়াময়, এমন যেন কখনও না হয়; না দয়াময়, তোমার ইচ্ছাই যেন পূর্ণ হয়—আমাদের বাসনা যেন তোমার কাজের অন্তরায় না হয়!

মঁসিয় ভিয়ার উঠল।

"ধন্যবাদ," লুই বলল, "তোর গলাটা খাসা চাঁছা-ছোলা রেখেছিস দেখছি; কিন্তু অন্য কিছু এবার শোনা, সুন্দরী সেই গেঁয়ো মেয়ের কাহিনীটা?"

"যাঃ! ওটা ভুলে গেছি, জাস্‌ম্যাঁর এই গানটাই মনে ছিল, এখন

যেটা গাইলাম।" ও এগিয়ে এল, অস্ফুটস্বরে আমি ওকে ধন্যবাদ দিয়েই একটু খোলা হাওয়া খাবার অজুহাতে গিয়ে হাজির হলাম ছাতে। না, না, লুইয়ের সামনে কিছুতেই এ-ব্যথার মুখ খুলব না। একটু পায়চারি করে বেশ শান্তি পেলাম। জানলাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হল, আলো এল। রাত আটটার সময় মঁসিয় ভিয়ার উঠল। রোজ আসবে,—কথা দিয়ে গেল।

কাল রাতে এগারটার সময় ডায়েরী লিখছিলাম, ভয় হচ্ছিল লুই বুঝি বকুনি দেয় এখনও জেগে আছি বলে। ও নিচে গিয়ে আফিসের কি হিসেব মেলাচ্ছে। আজ বহুক্ষণ ভগবানকে ডাকলাম, যেন আমাদের প্রার্থনা তিনি পূর্ণ করেন। কয়েক মিনিট বাদেই লুই এল।

"এ কি এখনও লিখছ! না গো, এ ভাবে শরীর খারাপ কোর না লক্ষীটি!"—তারপর আমায় আদর করতে করতে বলল, "কি সুন্দর যে লাগছে তোমায়!"

আমি হাসলাম।

"কি গো, হল?" ও অধীর হয়ে উঠল।

"এই হয়ে এল।" আমি জানালাম। তারপর খাতা বন্ধ করে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা লুই, তুমি আমায় সত্যি ভালবাস?"

"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ," ও বলল।

"আমিও তোমায় বড় ভালবাসি লুই, এ কথা তুমি বিশ্বাস কর?" আমার দুই চোখ জলে ভরে উঠল, শত চেষ্টায়ও তা ঢাকতে পারলাম না।

"কেন তুমি এ-কথা বলে আমায় কষ্ট দিচ্ছ?"

"আচ্ছা, অতীতের জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করেছ?"

"ক্ষমা? কিসের জন্য?" বলেই ও আমায় বুকে চেপে ধরল। তারপর আমরা ক্রুশের সামনে প্রার্থনা করলাম অভ্যাস মত।

মা-বাবার চিঠি পেয়েছি, ওঁরা প্রথম তারিখে আসছেন। এতদিন বাদে ওঁদের দেখব,—দিন যেন কাটছে না। ওঁদের জন্য ঘর গোছাতেই

সারা দিন কাটিয়ে দিলাম, দুজনের দুটি ঘর

লুই পই-পই করে বারণ করল নিজে নিজে এ-সব যেন না করি ; কিন্তু আমায় নিরস্ত করা সম্ভব নয় দেখে নিজেই ও লেগে গেল আমার সঙ্গে। বাবা-মা আসছেন বলে ওকেও বড় উৎফুল্ল লাগল।

মঁসিয়ঁ ভিয়ার এসেছিল ; ওকে জানালাম যে সপ্তাহখানেকের মধ্যেই মা-বাবা আসছেন।

"এমন মেয়ের মাকে দেখে ধন্য হব মাদাম। না জানি কত মহৎ ওঁর চরিত্র।" ও বলল।

"বাঃ ভিয়ার, নারী-মহলে তুই কথার খই ফোটাতে ওস্তাদ দেখছি।" লুই ঠাট্টা করল।

"উঁহু! কথার কথা নয় লুই, আমার মনের কথাই বলছি ভাই, এতটুকু মিথ্যা নয়।"

সকালে খাওয়ার পর নিয়ম মত বেড়াতে গেলাম জাকো-গিন্নির ওখানে। আশী বছর বয়স ভদ্রমহিলার ; দেখাশোনার কেউ নেই। আমায় উনি বড় স্নেহ করেন আর আমি যেতেই অভ্যর্থনা জানান, "পুণ্যবতী, ভগবান তোর মঙ্গল করুন।" নানা কথাবার্তা হয় ওঁর সঙ্গে। প্রায়ই ওঁর জন্যে ভাল ফল, কিংবা ভাল মদ, নয়ত পেয়ালা খানেক সুপ নিয়ে যাই। উনি একেবারে অক্ষম হয়ে পড়েছেন।

আজ ওঁর ওখানে যখন যাচ্ছি, লুই আর ভিয়ারের সঙ্গে দেখা। লুই হেসে প্রশ্ন করল, "কাদের বাড়ির বউ গো? একা সাত সকালে যাও কোথায়?"

"আমি জাকো-গিন্নির ওখানে যাচ্ছি লুই।"

"আমিও যাব, চল ভিয়ার।" বুড়ীর বাড়িতে তিন জনেই গিয়ে হাজির হলাম। দু জন ভদ্রলোককে বাড়িতে আসতে দেখে ভদ্রমহিলা দারুণ বিব্রত হয়ে পড়লেন। আমি তখন জানালাম যে আমার স্বামী ও তাঁর বন্ধু এসেছেন, উনি লুইয়ের হাত ধরলেন।

"তাই বলি বাছা! তুমিই আমার বউমার সোয়ামী? অসহায় এই বিধবাকে ও যে ভাবে সেবা করছে, ভগবান সেজন্য ওকে পুরস্কৃত করবেন, এই বিশ্বাস আমার অন্তরে বদ্ধমূল।" সস্নেহে উনি লুইকে বললেন, "সৈন্যবিভাগে কাজ কর? বেশ। আমার জোসেফও ওখানেই কাজ করত; বেচারা! আমার একমাত্র ছেলে! ক্রিমিয়া থেকে আর ফিরল না। এই ওর একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন আমার ঘর আলো করে আছে। উনি ইশারায় দেখালেন দেওয়ালে ঝুলনো একটা মিলিটারী পোশাক।

"ওর সাহস ছিল অসাধারণ।—ওর থেকে কি পাওয়া গিয়েছিল জান? মারী বোলেন-এর দেওয়া একটা লকেট আর আমার একটা চিঠি!" বুড়ী চোখ মুছলেন।

"ও এখন মাদাম তুসঁ্যা বুঝলে,—মারীর কথা বলছি। র‍্যু মাসেনা'র ধনী হোটেলওয়ালাকে ও বিয়ে করল। জোসেফ যে কি ভালই বাসত ওকে! যুদ্ধের শেষেই ওদের বিয়ে হবে ঠিক ছিল। মারী মেয়ে বড় ভাল; মাঝে মাঝে এখনও আমার দেখাশোনা করে। ওর স্বামীকে ধরে ও আমায় এই বাড়িটা কিনে দিয়েছে। ঘরে ওর ছটি সন্তান; আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ জননী। বেচারা জোসেফ!" বহুক্ষণ এ জাতীয় গল্প চলল। আমরা যখন চলে আসছি, উনি লুইয়ের হাত ধরে বললেন, "আচ্ছা বাবা, ভগবান নাকি বিধবাদের প্রার্থনা শুনতে পান? তা যদি সত্যি হয়, যে কটা দিন বেঁচে আছি আমি তোমার আর আমার বউমার মঙ্গলকামনায় রোজ তাঁকে স্মরণ করব।"

মা আর বাবা এসেছেন। লুই আর আমি দরজায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। পাঁচটা নাগাদ একটা ফিটন এসে থামল; আমরা দৌড়ে গেলাম। বাবাই প্রথমে আমাদের দেখতে পেলেন।

"এই যে মার্গরিৎ", উনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "বেশ দেখতে লাগছে ত তোকে!"

মা তাড়াতাড়ি নেমে এসে আমাকে আর লুইকে বুকে চেপে ধরলেন। আনন্দে দুই চোখে তাঁর অবিরল ধারাতে জল ঝরতে লাগল। বাবা যে কত বার আমায় চুমা খেলেন!

"বাবা, কত কাল বাদে যে তোমাদের দেখছি!"

"এখানে ভাল লাগছে ত মার্গরিৎ?"

"হ্যাঁ বাবা, খুব ভাল জায়গা।"

এই সব আলোচনার মধ্যে লুই এসে জুটল, "কি ষড়যন্ত্র হচ্ছে শুনি?" হেসে ও প্রশ্ন করল।

"বাবাকে বলছিলাম যে জায়গাটা বড় চমৎকার!"

ও চুপ করে থাকলেও ওর মুখর চোখ দুটি জল-জল করছিল।

"চল, ভেতরে যাওয়া যাক," ও ডাকল, "বেশ ঠাণ্ডা লাগছে মার্গরিৎ, আর বাইরে থাকা উচিত হবে না।"

মাকে ওঁর ঘরে নিয়ে গেলাম; সোফায় বসে আমার মুখ উনি দুই হাতে চেপে ধরলেন। মনে পড়ল, এভাবে একদিন আদর করতেন প্লুযারভেনের কঁতেস। দু ফোঁটা জল নেমে এল আমার চোখ দিয়ে। অনুশোচনা? না, মোটেই না, কারণ মুখে আমাব হাসি ছিল। মা আমার শিরশ্চুম্বন করলেন।

"মার্গো, ওকে তুই এখন ভালবাসিস ত?"

"হ্যাঁ মা!"

"জগতে সবার চেয়ে বেশী?"

"হ্যাঁ মা!"

মা হাসলেন; চেয়ে রইলেন আমার দিকে। "চল মার্গো, ভগবানকে আজ ধন্যবাদ জানাই তাঁর অসীম করুণার জন্য!"

"হ্যাঁ মা, চল।"

বিশ্ব-তারকের চরণ-তলে নতজানু হয়ে বসলাম আমরা—তারপর যখন বৈঠকখানায় গেলাম, দেখলাম লুই একা বসে আছে আগুনের ধারে,

আজকাল বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে ; পেছন থেকে গিয়ে ওর পিঠে হাত রাখতেই ও চমকে উঠল ; আমার দিকে তাকাল ; ওর কটা চুল আর প্রশস্ত কপাল আগুনের সামনে চক্‌চক্‌ করছিল ; দুই চোখে ওর সুখের আমেজ। ওকে বুকে ধরে জানতে চাইলাম, "একা বসে যে ? বাবা কই ?"

"ওপরে, ওঁর ঘরে আছেন।"

উঠে দাঁড়িয়ে ও আমায় ওর শূন্য স্থানে বসিয়ে দিয়ে বলল, "আগুনের ধারে একটু জিরিয়ে নাও গো ; বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।"

আমার পাশেই ও বসল। আমরা কতক্ষণ যে ও-ভাবে কাটালাম জানি না, হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল ; মঁসিয় ভিয়ার ঢুকল। ভদ্রলোক লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল।

"আয় রে!" লুই হেসে ডাকল ওকে ; তারপর যেমন ভাবে বসেছিল, সেই ভাবেই ও ভিয়ারকে হাত ধরে বসাল আমাদের কাছে।

ভিয়ার বলল যে, বাবা এসেছেন শুনে ও এসেছে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে।

"কিন্তু লফেভার, তোর কি শরীর খারাপ নাকি ?"

"আমার ? কোন্ দুঃখে ? একটু আরাম করছি রে। জানলি, যখন ওর কোলে মাথা রেখে শুই আর ওর হাত দুটো ভেসে চলে আমার ওপর দিয়ে, তখন আমি বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলি যেন।"

এমন সময় বাবা এলেন। লুই চটপট উঠে ওঁকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। ওঁর সঙ্গে ভিয়ারের আলাপ করিয়ে দিলাম ; মা না আসা অবধি বহু গল্পই হল। তার পর আমরা খেতে গেলাম।

আগামী পয়লা ডিসেম্বর আমরা নীস থেকে চলে যাব। কিছু দিন পারীতে কাটিয়ে আমরা ফিরে যাব আমার জীবনের বহু স্মৃতি-বিজড়িত বৃটানিতে। আমার ইচ্ছে, আমাদের সন্তান ওখানেই ভূমিষ্ঠ হোক, লুইও তাই চায়। বৈঠকখানায় চিমনীর পাশে মা আর আমি একদিন সন্ধ্যেবেলা বসেছিলাম। লুই আর বাবা বেরিয়েছেন। বৃটানির গল্প

হচ্ছিল। কঁতেস কেমন আছেন, আমি জানতে চাইলাম।

"মাথার অবস্থা খুবই খারাপ।" মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

"ওঁর ভাই ওখানেই আছেন?"

"হ্যাঁ মিলিটারীর কাজ ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বোনের দেখাশোনা করছেন তিনি।"

নানা স্মৃতি একের পর এক ফিরে আসছিল। হঠাৎ মা আমায় প্রশ্ন করলেন, "মার্গরিৎ, তুই এবার মা হচ্ছিস, তাই না?"—আমিও ওঁর মত আড়ষ্ট গলায় উত্তর দিলাম, "হাঁ মা!"—নীরব আশীর্ব্বাদে উনি আমায় বুকে টেনে নিয়ে জানতে চাইলেন, "কত মাস হল রে?"

"জানি না ত!"—শুনে মা হাসলেন।

"ওর প্রয়োজনীয় যা কিছু সব তৈরী রেখেছিস?"

আমি মাকে নিয়ে গেলাম আমাদের ঘরে। একে একে দেখালাম লুই আর আমি যা যা কিনেছিলাম ভাবী পুত্রের জন্য। মা ড্রয়ার খুলে বলে উঠলেন, "এই ছোট্ট বুট-জোড়া কি কাজে লাগবে রে? এই ভেলভেটের খুদে মিলিটারী টুপি, মিলিটারী পোশাক? এ-সব কি করেছিস মার্গরিৎ? হুঁ, এটা বরং দরকার লাগবে," বলে এক প্যাকেট লিনেন বার করলেন, "কিন্তু এত অল্পে কি হবে? বেশ, আমিই ওর কাঁথা-কোলটের বন্দোবস্ত করব, তুই ভাবিস না।"

"হ্যাঁ মা," আমি হাসলাম, "সেই ভাল, আমি ত এ সবের কিছুই জানি না।"—এমন সময় নিচে বাবার আর লুইয়ের গলা শোনা গেল। সিঁড়িতে লুইয়ের সঙ্গে দেখা। মা ওর সঙ্গে করমর্দন করে নেমে গেলেন। লুই আমার দিকে ফিরে জানতে চাইল, "কি ব্যাপার গো?"

"উনি জানতে পেরেছেন যে আমাদের ঘরে নতুন অতিথি আসছে। কি করে জানলেন বল ত?"

"এতে আর অবাক হবার কি আছে?" ও হাসল।

"ওহো তুমিই বুঝি বলেছ?"

"না গো !" বলে ও আমায় নিয়ে গেল আমাদের ঘরের মধ্যে।

"লুই, মা বলছিলেন ফেব্রুয়ারী নাগাদ ও জন্মাবে, সত্যি ?"

"হ্যাঁ গো, সবই ভগবানের মর্জি।"

"কিন্তু লুই—" একটু থেমে আমি বললাম।

"ও-সময় কিন্তু আমি বৃটানিতে থাকতে চাই।"

জানি না আমার গলা কেঁপে উঠল কি না, কারণ জাসমঁ্যার সেই করুণ গানটা হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল। চট করে লুই মুখ তুলেই আমায় জড়িয়ে ধরল।

"এতে আর বলার কি আছে গো ? তোমার মার চেয়ে ত এ সময়ে আর কেউ ভাল ভাবে তোমার শুশ্রূষা করতে পারবে না।"

বাবার কানেও মা কথাটা তুলেছেন বুঝলাম ; খাবার সময় তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, "ভগবান তোদের রক্ষা করুন মা, তোকে, লুইকে, তোদের ভাবী সন্তানকে।"

খানিক বাদে লুই এল। বড় আনন্দে কেটে গেল সন্ধ্যাটা।

আজ আমরা সবাই মঁসিয় ভিয়ারের স্টুডিও দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদের সেই ছবিটা ও দেখাল ; এখনও শেষ হয় নি ; তবু অতি অপূর্ব লাগল। আমি এক কোণে বসে আছি লুইয়ের দিকে মুখ নামিয়ে আর ও শুয়ে আছে ঘাসের ওপর, আমার কোলে মাথা রেখে। এক হাতে ও ধরে আছে আমার বুকের লকেটটা ; ওর মুখে মৃদু হাসি ; আমার মুখ যেন একটু গম্ভীর, তবু আশার মাধুর্যে মগ্ন। ছবিটার নাম দিয়েছে 'প্রেমের স্বপ্ন'।"—বাবার অত্যন্ত ভাল লাগল, মার ত কথাই নেই। লুইয়ের বড় পছন্দ হয়েছে ছবিটা, আমারও। কাল সকালে মঁসিয় ভিয়ার পারী চলে যাচ্ছে। আজ আমাদের এখানেই ও খাওয়া-দাওয়া করে বিদায় নিয়ে গেল।

লুই আর আমি জাকো-গিন্নিকে বিদায় জানিয়ে এলাম। আমরা দেশে যাচ্ছি শুনে বড়ই দুঃখিত হলেন উনি। ওঁর ঘরে ঢুকে দেখি,

একহারা চেহারার এক ভদ্রমহিলা বসে ; আমাদের অভিবাদন জানিযে উনি দুটো চেয়ার এগিয়ে দিলেন। ইনিই মারী বোলেন, বর্তমানে মাদাম তুর্স্যা।

"মা, তুই কাল চলে যাবি ?" অতি কাতর স্বরে বললেন জাকো-গিন্নি। "তোরা সুখী হ, এই প্রার্থনাই ম্যার জাকো তোদের জন্যে দিনরাত করবে রে !"

ওঁর কাছ থেকে আসার সময চুপি চুপি দুটো গিনি দিয়ে এলাম ওঁর হাতে। মারী বোলেন আমাদের পেঁীছে দিলেন দরজা অবধি।

এখনও আমরা পারীতেই আছি, তবে পরশু দিন দেশে যাব। এক নাগাড়ে বেশী রাস্তা যাই—লুই তা চায না, পাছে আমার কষ্ট হয। সর্বদা ওর সতর্ক দৃষ্টি—কিসে আমার ভাল হয। কাল ঠাকুমা আমাদের এখানে এসেছিলেন। প্রতিদিন বিকেলেই উনি আসেন, গাড়িতে চড়ে বেড়াতে যান আমাদের সঙ্গে ; রোজ সকালে আমি যাই ওঁর ওখানে। আমায় উনি বড় ভালবাসেন। কাল আমাদের সঙ্গে মা যেতে না পারায় উনি, লুই, আমি এই তিন জনই শুধু বেড়াতে গিযেছিলাম। বাবা গিয়ে ছিলেন ওঁর বন্ধুর বাড়ি। বুলোঞ্জি বাগানে ঠাকুমা আমাদের দুজনকে গাড়ি থেকে নামতে বললেন। ঘণ্টাখানেক ওখানে হাঁটার পর লুই আমায় গাড়িতে উঠতে ইঙ্গিত করল।

"কি গো, ক্লান্ত লাগছে না ত ?" উৎকণ্ঠিত ভাবে ও জিজ্ঞাসা করল।

"কি যে বলিস," ঠাকুমা ঠাট্টা করলেন, "আমি থুথ্‌ুরে বুড়ী, দিব্যি তাজা আছি, আর ও কি না ক্লান্ত হযে পড়বে ?"

"কিন্তু এ অবস্থায় ওর বেশী হাঁটাহাঁটি করা ভাল নয়," ওঁর পেছন পেছন গাড়িতে ঢুকে লুই বলল। ঠাকুমা কযেক মিনিট কি ভাবলেন, তার পর আমার দিকে তাকালেন, "ওহো, এতক্ষণে আঁচ করেছি। তাই নাকি রে ?"

আমি লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইলাম।

"এই ত তোর গাল দুটো কেমন টুকটুকে লাল হয়ে উঠেছে বাছা, আমার বাহাত্তরে না পেলে কি এত দেরি লাগত বুঝতে?" বলে উনি আদর করলেন।

"ভাবতেও কেমন লাগে যে তুই আজ মা হতে চললি, আর আমি, এখনও আইবুড়া রয়ে গেলাম! বলি খুদে শয়তানটা আসছে কবে?"

"বোধ হয় ফেব্রুয়ারী মাসে, ঠাকুমা!"

"আর ত মোটে ক'দিন!" উনি উল্লাসে অধীর হয়ে উঠলেন, "তাই বলি তোর এমন চেহারা হয়েছে কেন; ষোল বছরে বিয়ে হওয়ার এই এক ঝামেলা বাপু; সতেরোতে পা দিতে না দিতে কোলে একটি ট্যাঁ ট্যাঁ করবে। কিন্তু তুই আমায় প্রণাম করলি না ত?"

ওঁর বাসনা পূর্ণ করলাম।

"অগাধ সম্পত্তির মালিক হবে রে তোর ছেলেটা; দেখিস, আদরে মাথাটা খাস না যেন!"

বাড়ি না যাওয়া অবধি এই কথাই হচ্ছিল।

বৃটানি। দেশে ফিরে যে কী ভাল লাগছে! যে দিন পৌঁছলাম, বরফ পড়ছিল। একটা প্রকাণ্ড সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে প্রকৃতি উপভোগ করছিলেন জ্যোৎস্নার রজত-আশাষ; চার দিক ঝলমল করছিল। ভাল পশমী কাপড়ে লুই আমার সারা গা সযত্নে ঢেকে দিল; বাবা বললেন টুপিটা মুখ অবধি টেনে আনতে। আমাদের গাড়ি অপেক্ষা করছিল; উঠে বসতেই ঘোড়া দুটো টকাটক্ টকাটক্ করে দৌড় দিল। তেরেস বাড়ি পাহারা দিচ্ছিল। আমাদের প্রতীক্ষায় ছিল। আমায় দেখে কি ওর আদরের ঘটা, "এই ত দিদি, ফিরে এলি ঘরের মেয়ে ঘরে!"

লুই ওকে অভিবাদন জানাল; আমরা খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম;

ওখানে শুকনো আঙুর-লতার গনগনে আগুন সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল। তেরেস আমার গরম জামা, জুতো খুলে নিল; ওগুলো তুষারে ভরে গিয়েছিল। মা ওঁর ঘরে গেলেন। এত দিন বাদে সবাই বাড়িতে জড়ো হয়েছি, ওর মুখে হাসি ধরে না! লুই আর বাবা গেলেন পোশাক বদলাতে। আমায় শুকনো জামা-কাপড় এনে দিয়ে তেরেস আমার পা চিমনির ধারে তুলে দিল। ওকে ধন্যবাদ দিতে গেলাম; ও বাধা দিল, "তুই এসেছিস খুকুদি, আজ আমার বড় আনন্দের দিন, দেখছিস না, তোর জন্যে ভেবে ভেবে আমি কত বুড়ো হয়ে গেছি? কিন্তু তোকে দেখে এখন মনে হচ্ছে দশ বছর বয়স আমার কমে গেছে একদিনে; খুদে মঁসিয় যে আসছেন, তাঁর উপযুক্ত দাই হবার মত শক্তি এখনও রাখি। তোরও আমি দাই ছিলাম না? তোর মায়ের? আর এবার তোর ছেলের দাই হব!"

ওর কথাগুলো শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল ভাবের অনুভূতিতে। আমাদের ছেলে। আমার সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চিন্তা আজ ওকে ঘিরে; লুইয়েরও সেই দশা। মা ওর জন্যে কাঁথাকোলট তৈরী করছেন। লুই নীস্ গিয়েছে; সপ্তাহ খানেক ওখানে থাকতে হবে। অন্ততঃ দুই মাসের ছুটি নিয়ে ফিরবে। বড় সুন্দর ভাবে খ্রীষ্টমাস কাটল। সকাল আটটায় গীর্জাতে গিয়েছিলাম। সারা গ্রাম ওখানে ভেঙ্গে পড়েছিল। সবাই আমার সঙ্গে করমর্দন করলে, সবাই গায়ে পড়ে দু দশটা ভাল কথা শোনাল। কৃতজ্ঞতায় নত হৃদয়ে আমি বসলাম গিয়ে বেদীর সামনে। দোলনায় শোয়ানো নবজাত যীশুকে প্রণাম করলাম। ভাবতে লাগলাম, আমার সন্তানের কথা। মা, মেরী, আমায় পথ দেখাও, আমায় বল দাও, প্রাণে আমার শক্তি দাও, আমি যেন আদর্শ জননী হতে পারি। লুই ছিল আমার পাশে; ওর ভাবনা আর আমার ভাবনা একই খাতে বয়ে চলেছিল।

মঁসিয় ভালুপোয়ান আর তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে আমাদের বাড়ি

এসেছিলেন। রুদ পুরুষসুলভ গাম্ভীর্যে আমার সঙ্গে করমর্দন করল। হেলেন আমায় দেখে লজ্জায় কথাই বলছিল না ; ওর মায়ের আড়ালে আড়ালে ঘুরছিল ; শেষ পর্যন্ত কিন্তু ওর আগের বাচালতা বেরুতে দেরি হল না। ছোট্ট পিয়েরের দিকে হাত বাড়াতেই ঝুম করে ও চলে এল।

কাল গিয়েছিলাম কঁতেসকে দেখতে ; সঙ্গে ছিল লুই। ও আমায় বারণ করে দিল, যেন অনর্থক নিজেকে দুর্বল না করে ফেলি। একা গিয়ে ওর ঘরে ঢুকলাম। ত্ব্যনোয়ার পুরনো চাকর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল, "মামজেল আর্ভের!"—

ও আমার বৈঠকখানায় নিয়ে গেল। কঁতেস একটা সোফায় শুয়েছিলেন। চিমনীর ধারে বসেছিলেন কর্ণেল। উনি কাগজ পড়ছিলেন ; আমায় প্রথমে দেখতেই পান নি। কিন্তু আমায় দেখে কঁতেস ধড়মড় করে ওঠাতে উনি ফিরে তাকালেন।

"ত্ব্যনোয়া যেখানে আছে, সেই দেশ থেকে ও ফিরেছে ; বল মা, ত্ব্যনোয়ার খবর কি?" কঁতেস ধরে বসলেন ; হেসে আমার হাত দুটো ধরলেন। আমার বুক যেন ফেটে যাচ্ছে।—"আচ্ছা, ওকি ওর ভাইকে খুন করে নি?" ফিস্ ফিস্ করে আমায় উনি প্রশ্ন করলেন। কর্ণেল ওঁকে সোফায় শুইয়ে দিলেন। উনি হাসলেন। ওর কথামত শুয়ে রইলেন। চুপি চুপি কর্ণেল আমায় জানালেন যে দিন দিন অবস্থা খারাপের দিকেই যাচ্ছে।

"এই ক'দিন আগে ত দেখে গিয়েছিস ওকে ; আর এখন দেখ্, কি রোগা আর বুড়ী হয়ে গেছে এর মধ্যে।" কর্ণেল বললেন।

"হ্যাঁ, তাই ত দেখছি।" ওঁকে দেখে আমায় চোখে জল এল।

"তুই আনন্দে আছিস ত মা?" কর্ণেল জিজ্ঞাসা করলেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" ওর দিকে চোখ তুলে উত্তর দিলাম।

খানিক কথা-বার্তার পর উঠলাম, কঁতেস অভ্যাস মত আলিঙ্গন জানালেন। কর্ণেল গাড়ি অবধি এলেন, লুইয়ের সঙ্গে করমর্দন করলেন।

"মঁসিয়, ও তোমায় পেয়ে সুখী হয়েছে ; ভগবানকে ধন্যবাদ জানাই সর্বান্তঃকরণে। ওরই সুখী হওয়া সাজে !"

মাদমোয়াজেল গোসরেল আমাদের এখানে সেদিন এসেছিল। সঙ্গে ছিলেন আর একটি ভদ্রলোক। ছুটে এসে ও আমায় জড়িয়ে ধরল ; তারপর সঙ্গীর পরিচয় দিল, "ইনি হচ্ছেন মঁসিয় লাকোস্ত, মার্গরিৎ, আমার ভবিষ্যৎ স্বামী ; দেখলি ত, তোর মত ঢাকাঢুকি আমার স্বভাব নয়।" বলে সে কি হাসি ! "বুঝলি, ব্যাঙ্কার ! টাকার কুমীর !"

সহাস্য মঁসিয় লাকোস্তের দিকে আমি তাকাতে গোসরেল বলে চলল, "উনি আমায় হাড়ে হাড়ে চিনেছেন ; জানেন, ওঁকে আমি কত ভালবাসি আর সোনা-দানার প্রতি আমার টান কত। তাই না রিশার ?"

হেসে উনি উত্তর দিলেন ; "ধন্য ওরতাঁস, বলিহারি তোমার প্রখর বুদ্ধির !"

গোসরেল একটু গম্ভীর ভাবে জানতে চাইল, "আচ্ছা মার্গরিৎ, তোর শরীর কি এখনও সারে নি ? এসে দেখলাম তুই সোফায় শুয়ে আছিস।"

একটু মুস্কিলে পড়লাম, "নাঃ ভালই ত আছি !"

"মঁসিয় লফেভার কই ? ওর নাম দিয়েছি ক্রুদ্ধ সৈনিক।"

"নীস্-এ গিয়েছেন।"

"ওহো, ওর রেজিমেণ্ট বুঝি এখন ওখানে ?"

"হ্যাঁ।"

"মিলিটারীকে বিয়ে করার অসুবিধে কত দেখেছিস ত ? বাড়িতে অতি অল্প সময়ই ওরা কাটাতে পারে ; তা ছাড়া যুদ্ধের সময় ত···"

"এখন ত আর যুদ্ধ নেই কোথাও, আর কোথাও লাগার সম্ভাবনাও ত দেখি না !" আমি উত্তেজিত হয়ে বাধা দিলাম। তার পর গর্বের সুরে বললাম, "সৈনিকের কর্তব্যই ত হল দেশের বিপদে এগিয়ে যাওয়া, সব ধর্মের ওপর তার ধর্ম হচ্ছে স্বদেশপ্রেম !"

"দেখলে ত রিশার, কি ভাবে স্বামীকে পাখার আড়ালে ঢেকে রেখেছে! কবে ফিরছে মঁসিয় লফেভার?"

"সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই। আন্দাজ দুই-তিন মাস ছুটি নিচ্ছে!"

"ওঃ, সুন্দরীর পাশে বসে কাটাবার জন্য? আশা করি বেচারার ছুটি মঞ্জুর হোক।"

যাবার আগে গোসরেল ওর বিয়েতে যাবার জন্য নেমন্তন্ন করে গেল, "আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী, বুঝলি মার্গরিৎ? আসা চাই-ই!"

"হ্যাঁ, যদি যেতে পারি।"

"তার মানে! যদি স্বামী যেতে দেয়? বেশ, তোর স্বামীর নামেও চিঠি পাঠাব; একটু চেপে ধরলেই রাজী হয়ে যাবে, বুঝলি? তোর ঐ গোলাপী ওষ্ঠের একটা স্পর্শই ওকে কাত করতে যথেষ্ট!"

নতুন বছর শুরু হয়েছে। লুই ফিরেছে আজ। পকেটে তিন মাসের ছুটির অনুমতি। কত দিন বাদে যেন ওকে দেখলাম। বাবা আমায় নড়াচড়া করতে দেন নি; তাই আপন মনে দাঁড়িয়েছিলাম বাইরের ঘরের দরজায়। বহু দূর থেকে লুইকে দেখতে পেলাম,—ঘোড়ায় চড়ে আসছে। তর-তর করে ও সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। আমি মুখ ঢাকলাম ওর বুকে। বহুক্ষণ ওই ভাবে ছিলাম, এমন সময় বাবা এসে গেলেন।

"বাইশ বছরেই কি কেউ এমন প্রেমে পড়ে?" হেসে উনি বলাতে লুই ওঁর দিকে তাকিয়েই বড় অপ্রস্তুত হল। ওঁর সঙ্গে করমর্দন করল, বাবা ওর কপালে এঁকে দিলেন স্নেহচুম্বন।

"যা বাবা, তোর ওপর ভারি সন্তুষ্ট হয়েছি; ছুটি মঞ্জুর হল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তিন মাসের ছুটি।"

বাবা বাইরে গেলেন; লুই ঢুকল আমাদের ঘরে, ময়লা জামা-কাপড় বদলাতে; আমি ওকে অনুসরণ করলাম।

"বুঝলে গো, আমাদের ওপরওয়ালা কর্ণেল লোকটি বড় ভাল,"

আমার দিকে সরে এসে ও বলল, "ওঁর কাছে ছুটি চাইতেই উনি কারণ জানতে চাইলেন। পারিবারিক ব্যাপারে ছুটির প্রয়োজন শোনামাত্র উনি তক্ষুনি ব্যবস্থা করে দিলেন।"

ওকে মাদমোয়াজেল গোসরেলের নিমন্ত্রণের কথা জানাতে ও হাসল।

"তোমার পক্ষে ত তখন যাওয়া অসম্ভব, আমারও সেই অবস্থা, কারণ তখন যে আমাদের ঘরে বাতি জ্বলবার সময়, না গো?" বলে আমায় আকুল চুমায় ভরে দিল।

পরশু রাতে বড় খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। ধড়মড় করে উঠে তাকিয়ে রইলাম আমার স্বামীর দিকে। চিমনীর অস্পষ্ট আলো এসে ওর মুখে পড়েছে। কি প্রশান্তিতেই ও ঘুমিয়ে আছে। আমার চোখ থেকে দুই ফোঁটা জল ঝরে পড়ল ; হায় ভগবান সত্যি কি তবে আমায় চলে যেতে হবে এই পৃথিবী থেকে? আমার সুখের প্রভাত সবে হয়েছে শুরু, আর এরই মধ্যে তলব আসবে? সন্তর্পণে স্পর্শ করলাম ওর কপাল, "কি গো, কি বলছ?" বলে ঘুমের ঘোরেই ও আমায় বন্দী করল স্নেহাতুর বাহুপাশে। ওর বুকে বুক দিয়ে বহুক্ষণ জেগে রইলাম। উঃ, এ কি দুঃস্বপ্ন!

কাল রাতে লুইকে স্বপ্নটা বললাম। রাত তখন দশটা হবে ; কাপড়-জামা বদলে জানলার কাছে অপেক্ষা করছিলাম লুইয়ের জন্য। বাইরে সব কিছু সাদা ধবধব করছে ম্লান জ্যোৎস্নায। খানিক পরেই লুই এল। আমি উঠে দাঁড়ালাম ; পরস্পরের সান্নিধ্যে আমরা চেয়ে রইলাম বাইরের দিকে। গাছ থেকে এক এক করে ঝরে পড়ছে শুক্‌নো পাতা, টুপ টুপ করে টোকা দিয়ে যাচ্ছে আমাদের জানালার কাচে, প্রজাপতির মত হাল্কা পাখায় কোথায় উধাও হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আমি বলে উঠলাম, "লুই, আবার যখন আসবে গাছে গাছে সবুজের

জোযার, আমায তখন আর তোমার পাশে পাবে না ; আমি তখন শীতল ঘাসের তলায় চিরবিশ্রামে মগ্ন থাকব !"

"ভগবান, এ-ব্যথা যেন সইতে না হয়, প্রভু !' ওর মুখ দিয়ে কথা কটি বেরিযে এল। দারুণ আবেগে ও আমায় ঘিরে ধরল সমস্ত অঙ্গ দিয়ে। তার পব আমায শুনিয়ে একটু ঠাট্টার স্বরেই বলল, "কি যে সব আজে-বাজে চিন্তা তোমার ! তোমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গিয়েছিল, ছেলের মা হতে চলেছ—এই সব কথা বুঝি রাত দিন ভাবছ ? গেল সপ্তাহে আমি এখানে ছিলাম না, সেই অনুপস্থিতির ফাঁকে ছোট মাথাটি একেবারে দুশ্চিন্তাব আঁতুড়-ঘর করে তুলেছ !"

"তুমি হযত ঠিকই বলেছ লুই, কিন্তু কাল রাতে যা স্বপ্ন দেখেছি,—ভযে আমি আকুল হযে উঠেছি !"

"আচ্ছা বিপদ, আমাকে ডেকে তুললে না কেন ? এই অবস্থায় কখনও মনে ভয় পুষে রাখতে হয ?"

"তুমি এমন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছিলে, ডাকতে মায়া হল। আমি তোমার গা ঘেঁষে শুলাম, তুমি আমায টেনে নিলে তোমার বুকে, আদর করে কি যেন বললে ; তাতেই আমি অনেকটা স্বস্তি পেলাম।"

"আচ্ছা, তোমার স্বপ্নটা শোনাই যাক", চপল কণ্ঠে ও বলল, "তোমার মত সাহসী মেয়ের মনে ভয় যখন ঢুকেছে, মনে হয় অতি ভযঙ্কর কিছু দেখেছ স্বপ্নের ঘোরে।"

"স্বপ্ন দেখলাম যে, আমি একা শুয়ে আছি, এমন সময় কে যেন টোকা দিল পাশের জানলায় ; ঘুম ভেঙে আমি উঠতে পারছি না, এত অবসন্ন লাগল। এমন সময যেন বাবার গলা শুনলাম, দরজা খুললাম, দেখি কেউ নেই। বাইরের ঘরে গেলাম, তোমায় দেখতে পাব ভেবে। দরজা খুলে ঢুকে দেখি তুমি দাঁড়িয়ে আছ জানলার ধারে, বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে। আমি গেলাম, জড়িয়ে ধরলাম তোমায়, তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না ভেবে যেমন চোখ তুলেছি, দেখি, কই তোমার মুখ !

মৃত্যু নিজে দাঁড়িয়ে আছে।—তখুনি আমার ঘুম ভেঙে গেল।”

লুই আগা-গোড়া মন দিয়ে শুনল। শেষ হওয়ামাত্র হেসে বলে উঠল, “দেখ গো, ভাল করে চেয়ে দেখ এখন আমায়, যমের মত লাগছে না কি!”

“ধেৎ!” আমি জবাব দিলাম। ওর অপূর্ব চেহারা, আশা আর স্নেহে ভরা চোখ, অসীম ভালবাসা ভরা হাসি আর আনন্দোচ্ছল মুখ দেখে আমার ভয় সব উবে গেল। আমি ওর মুখে মুখ রেখে আপন মনে বলে উঠলাম,—

“তোমার নয়ন উদিবে হেথায়
তারকা-সম,
তাহারি রশ্মি উজলিবে প্রিয়
স্বপ্ন মম।”

ও হাসল, “মার্গরিৎ, আমার উদ্দেশ্যেই বলছ না কি?” বলে আমায় ওর বুকে টেনে নিল। তারপর একটু গভীর গলায় বলল, “আচ্ছা, মার্গরিৎ, কোন্ প্রাণে তুমি ভাবতে পার যে আমাদের এই সদ্য সাজানো সংসার থেকে ভগবান তোমায় সরিয়ে নেবেন? না মার্গরিৎ, এ-কথা মনে রেখ যে ভগবান এত নিষ্ঠুর হতে পারেন না।”

আমি চুপ করে রইলাম। কে জানে? ভগবান যা করেন তা আমাদের মঙ্গলেরই জন্য, বাইরে থেকে সব সময় তা সহনীয় না হতেও পারে!

শেষ কথা

১৪ই ফেব্রুয়ারী মার্গরিতের ছেলে হয়। ওর মা বাড়ি ছিলেন না। জেনারেল তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলেন অসুস্থা এক পুরোনো বান্ধবীর বাড়ি, প্রায় মাইল দুয়েক দূরে। মার্গরিৎ জোর করেই ওর মাকে পাঠিয়েছিল, নয়ত ভদ্রমহিলা যেতে চাইছিলেন না। বিকেল চারটে নাগাদ যন্ত্রণা শুরু হয়। ওর স্বামী কি লিখছিল বৈঠকখানায়। পাশেই ও বুনছিল। কয়েক মিনিট বাদে ও সোফায় শুয়ে পড়ল। স্বামী তাড়াতাড়ি ঘাড় ঘুরিয়ে জানতে চাইল, "কি, কি হল ?"

"কিছু না গো, বড় ক্লান্ত লাগছে।"

ও উঠে এসে বসল স্ত্রীর পাশে। দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেও ও তা ঢাকতে চেষ্টা করছিল। দু জনে হাত ধরাধরি করে বসে রইল নীরবে।

"লুই", শেষ পর্যন্ত ও বলল, "আমি ওপরে যাচ্ছি, শরীরটা কেমন যেন করছে।"

উঠে দাঁড়াল ও। ঘরটা যেন ওর চারিদিকে ঘুরতে লাগল। টপ করে ও বসে পড়ল।

"লুই, বড় দুর্বল লাগছে!"

ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে লুই একটা কৌচে শুইয়ে দিল আস্তে আস্তে। "তুমি নড়ো না যেন, লক্ষ্মীটি, তোমার মাকে আমি ডাকতে যাচ্ছি, আর ডাক্তারকে খবর পাঠাচ্ছি।"

ও বেরিয়ে গিয়ে তেরেসকে পাঠিয়ে দিল। আনন্দে দিশেহারা হয়ে দাইটা ওর পোশাক-পরিচ্ছদ খুলতে লাগল।

"আজই না তেরেস ? বাছা আজ আসছে ?"

"হ্যাঁ, খুকুদি।"

তেরেস ওকে ড্রেসিং গাউন দিতে গেলে ও হেসে বলল, "সব চেয়ে ভালটা দে তেরেস এখুনি লোকজন আসবে।"

পৌনে এক ঘণ্টা কেটে গেল, ব্যথা বেড়েই চলল। ওর চোখ ফেটে জল পড়তে লাগল। ঝি গেল গরম জল আনতে। দুই হাত মুখ ঢেকে ও জানালার ধারে বসেছিল; স্বামী এসে ঢুকল; ওর মুখ থেকে হাত সরিয়ে দেখল, ও কাঁদছে।

"বেচারা! এত কম বয়সে এই কষ্ট।" ওর কপালে চুমা দিয়ে ও বলে উঠল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা···যন্ত্রণা হচ্ছে খুব বেশী?"

ওকে আশ্বস্ত করবার জন্য হাসতে চেষ্টা করে মার্গরিৎ জবাব দিল, "না গো, সামান্য ব্যথা!" কিন্তু ও ক্রমশই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে দেখে মার্গরিৎ বলল, "এ ব্যথা সবই ভুলে যাব গো যখন কোল-জোড়া ধন আসবে। এত বড় পুরস্কারের বদলে যন্ত্রণা সইতেই হবে!"

স্বামীর হাত ধরে গিয়ে ধীরে ধীরে ও শুয়ে পড়ল। ঢং ঢং করে ছটা বাজল। আরও আধ ঘণ্টা গেল। লুই ছটফট করতে লাগল ডাক্তারের দেরি দেখে। ও উঠছে দেখে মার্গরিৎ জড়িয়ে ধরল ওকে যন্ত্রণার ঘোরে।

"যেও না লুই, একা বড় ভয় করছে, যেও না গো।"

"চুপ কর লক্ষ্মীটি, একটু শান্ত হতে চেষ্টা কর।"

হাঁটু গেড়ে ও বসে পড়ল বিছানার পাশে, স্ত্রীর মাথা কাঁধে রেখে। মার্গরিতের চাপা নিশ্বাস, অনর্গল অশ্রু—এসব দেখে বোঝা যাচ্ছিল কী যন্ত্রণা ওর হচ্ছে। সাতটা বাজল; সুদীর্ঘ এক নিশ্বাস ফেলেই ও অজ্ঞান হয়ে গেল। প্রসব হয়ে গেল। ঠিক সেই সময় বাড়ির দরজায় এসে থামল একটা গাড়ি। ওর মা এলেন। ফেরার পথেই ওঁর কাছে খবর পৌঁছেছে। উনি ঘরে ঢুকতে কাপ্তেন উঠে দাঁড়াল, স্ত্রীর মাথা বালিশের ওপর রেখে ওঁর কাছে গিয়ে সংক্ষেপে বলল, "দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে ও অজ্ঞান হয়ে গেছে; ছেলে হয়েছে।"—তারপর

বেরিয়ে গেল। ওর মার সঙ্গে সঙ্গে তেরেস এল ; দশ মিনিট বাদে এলেন ডাক্তার ; পাশের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে কাপ্তেন সব কথা খুলে বলল ওঁকে।

"ওর মা এখন ওর কাছে আছেন", ও বলল শেষে।

ঘরের দরজা খুলে গেল। মাদাম আর্ভের ডাকতে এলেন মঁসিয় শাঁতোকে, "আসুন ডাক্তার বাবু, খাসা নাদুস-নুদুস ছেলে হয়েছে!"

লুই আর ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন। তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে ও চোখ বুজে শুয়ে ছিল। ডাক্তার নাড়ী দেখলেন। আধ ঘণ্টা চেষ্টার পর ও চোখ খুলতেই প্রথম তার সঙ্গে চোখাচোখি হল। ওকে আশ্বস্ত করবার জন্য হাসল মার্গরিৎ। কপাল চুম্বন করে ওর স্বামী হাত রাখল ওর হাতে।

"বাচ্চাটা কেমন আছে গো?" চুপি চুপি মার্গরিৎ প্রশ্ন করল। মাদাম আর্ভের লুইয়ের হাতে ছেলে দিতেই লুই তাকে রাখল প্রসূতির বুকে। মার্গরিৎ বহুক্ষণ চেয়ে রইল তার দিকে : ওর মুখে ফুটে উঠল বিজয়িনীর হাসি। "ওগো, এই দেখ আমাদের সন্তান!" তারপর অপূর্ব হাসি হেসে বলল, "কি গো, ছেলে যে বাপের হামি চায়!"

লুই বসে মাকে আর ছেলেকে আদর করল।

"ভগবান আমার স্ত্রী-পুত্রের মঙ্গল করুন, তিনিই তাদের রক্ষা করুন সর্বদা!"

ডাক্তার ওর হাতে এক গ্লাস পানীয় দিয়ে বললেন, পোয়াতীকে সবটা খাইয়ে দিতে।

মার্গরিৎ উঠে বসতে চেষ্টা করল।

"না মা শুয়ে থাক, এখনও তুমি বড় দুর্বল।" "হাঁ হাঁ" করে উঠলেন ডাক্তার শাঁতো।—গ্লাস থেকে খানিকটা খেয়ে ও স্বামীকে বলল, "আর পারছি না।"

"কিন্তু এটুকু যে খেতেই হবে।"

অমনি মার্গরিৎ চুমুক দিয়ে খেয়ে নিল সবটা।

"যত পার খাওয়া-দাওয়া কর হে", ডাক্তার বললেন, "তা নয় ত নতুন মানুষটির খাওয়ার যোগাড় হবে কোথা থেকে? এমন গুণ্ডা ছেলে অল্পে শান্ত হবে না, একথা বলে রাখলাম।"

ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন লুইয়ের সঙ্গে।

"কেমন দেখলেন?" লুই ব্যস্ত হয়ে উঠল।

উত্তরে ডাক্তার ছোট্ট একটা শিস দিলেন।

"বলুন মঁসিয় শাতো", লুই অধীর হয়ে জানতে চাইল। ডাক্তার ওর কাঁধে হাত রাখলেন।

"সবুর বন্ধু, ধৈর্য ধর। মার্গরিতের জন্ম থেকেই আমি ওকে দেখছি, ভেতরে ভেতরে ওর স্বাস্থ্য খুবই ভাল। এটা একটা আশার কথা। কিন্তু ওর বয়স সতেরো বছরও হয়েছে কি না সন্দেহ। এটা ভাল-মন্দ দুই-ই; ওর এখনও মা হবার বয়স হয় নি। কিন্তু ওর তারুণ্যের জোর আছে। এ-সময়ে অসুখ ও দৌর্বল্যের সঙ্গে লড়াই জিতে ও বেরিয়ে আসতে পারবে মনে হয়। ওর স্বাস্থ্য কি এখনও আগের মতই অটুট আছে?"

"আমাদের বিয়ের আগে গত এপ্রিল মাসে ওর যে অসুখ হয়েছিল, তাতে ও অনেকটা রোগা ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আর মে মাসে আমাদের বিয়ে হয়।"

"হাঁ হাঁ, তখনও ও পুরোপুরি সেরে ওঠে নি!"

খানিকক্ষণ মঁসিয় শাঁতো আগুনের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু শিস দিলেন।

"আচ্ছা, বিয়ের পর আর অসুখ হয় নি, না?"

"উঁহু, দু বার খালি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।"

ডাক্তারের কালো প্রখর চোখ দুটি লুইয়ের বিষণ্ণ মুখে কিছু খুঁজছিল, "ঘাবড়াবার কিছু নেই হে, ওর বয়স অল্প, সেরে উঠবেই!" বলে তারপর স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন, "ভয় পেয়ো না বন্ধু, ঘাবড়াও কেন? এ-বয়সে

কোন বাধার কাছেই হার মানে না লোকে—এ আমার স্থির বিশ্বাস!"

ওঁরা ঘরে ঢুকলেন। মার্গরিৎ দরজার দিকে চেয়ে স্বামী আসছে দেখে হাসল। "কোথায় গিয়েছিলে গো? বোস এখানে!"

বিছানাতেই একটু জায়গা করে নিল ও; লুই বসল।

"কি সুন্দর দেখতে হয়েছে ছেলেটা?" মার্গরিৎ বলল।

স্বামীর হাত নিয়ে বাচ্চাটার হাতের উপর রাখল মার্গরিৎ। "কি নরম না? তেমনি মোটা-সোটা। মা বলছিল দেখে ছ মাসের ছেলে মনে হয়; ওর চোখ দুটি কিন্তু হুবহু তোমার মত হয়েছে: অমনি স্বচ্ছ, অমনি গভীর; কিন্তু ছেলে সহজে চোখ খোলেন না। ওর চুলগুলো কেমন বল তো?"

"ঠিক তোমারই চুলের মত কুচকুচে কালো," উত্তর দিল লুই।

"হুঁ, আর সবই তোমার মত হয়েছে।"

"খালি আমার প্রশংসাই করবে নাকি গো?" দুষ্টু গলায় লুই জানতে চাইল।

"আমি এক বর্ণও মিথ্যা বলছি না গো; মাকে জিজ্ঞাসা কর না। আচ্ছা মা, ছেলেটা ঠিক লুইয়ের মত দেখতে হয়েছে না?"

"উঁহু, এখন বেশী কথা না বলাই ভাল", মঁসিয় শাঁতো বাধা দিলেন, "একটু ঘুমিয়ে নাও বাছা। বঁ সোয়ার!"

বাচ্চাটা হঠাৎ ককিয়ে উঠল, মার্গরিৎ ব্যস্ত হয়ে ডাক্তারের দিকে তাকাল, "বোধ হয় খিদে পেয়েছে ডাক্তারবাবু!"

"বেশ ত, দুধ দাও।"

লজ্জায় গৌরবে লাল হয়ে উঠল মার্গরিৎ।

"কিন্তু ঘন ঘন ওকে জাগিও না দুধ খাওয়াবার জন্য, তা হলে তোমার স্বাস্থ্য খারাপ হবে!"

ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন। সব বাতি নিভিয়ে দেওয়া হল। ছোট একটা টেমি আর চিমনীর আলো ঘরে ছিল। ছেলেটার দিকে পরম

আনন্দে মা তাকিয়ে রইল। অব্যক্ত এক সুখে ওর সমস্ত রক্ত ছলকে উঠল সারা গালে, যখন বাচ্চাটা মোটা ঠোঁট দুটি দিয়ে টিপে ধরল ওর স্তনাগ্র, ওর স্বামী পাশে বসে হাসছিল মিটি মিটি। বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়ল। দুধে-মাখা সাদা কচি মুখ থেকে মাতৃস্তন্য আলগা হয়ে পড়ল। এমন সময় জেনারেল মেয়ের কাছে এলেন।

"কি রে মার্গো, আজ সন্ধ্যা থেকে আমি তাহলে দাদামশাই হলাম?" বললেন উনি। লুই তাড়াতাড়ি উঠছে দেখে ওকে মানা করলেন উনি, "বস বাবাজী!" মেয়েকে চুমা দিলেন কপালে।

"ভগবান তোকে রক্ষা করবেন", বলতে বলতে ওঁর গলা ভারী হয়ে উঠল। তার পর বসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন লাগছে মা? বড় দুর্বল না?"

"সামান্য!" বলেই ঠোঁট ফুলিয়ে ও জিজ্ঞাসা করল, "কই বাবা, এক বারও তোমার নাতিকে দেখতে চাইলে না ত?"

"আমার নাতি!" জেনারেল এমন ভান করলেন, যেন আকাশ থেকে পড়ছেন, "উঃ এর মধ্যেই দাদামশাই হয়ে গেলাম! এমন জানলে শ্রীমানের সঙ্গে মার্গোর বিয়ে দিতাম না। ষাট বছরে পা দেবার ত এখনও কত দেরি! দেখতে দেখতে কত্তাদাদু হয়ে যাব এ ভাবে চললে!"

প্রাণ খুলে হাসতে লাগল মার্গরিৎ। সেই উচ্ছল হাসিতে সবারই বুক ভরে উঠল। মার্গরিৎ ওর স্বামীকে তিনটে বাতি জ্বালাতে বলল যাতে করে বাবা ভাল করে ছেলের মুখ দেখতে পান।

দাদামশাই বহুক্ষণ চেয়ে রইলেন নাতির দিকে। যৌবনের কথা তাঁর মনে পড়ল যখন প্রথম তিনি কোলে নিয়েছিলেন তাঁর খুকীকে। চোখের সামনে ভেসে উঠল মশারী-খাটানো বিছানাটার ছবি! অতি স্নেহের সঙ্গে উনি বাচ্চাটার কপালে চুমা দিলেন।

"আজ আমার মনে পড়ে যাচ্ছে, তোর জন্মের কথা। কিন্তু তোর

মা এত দুর্বল ছিলেন না, অবশ্য ওঁর বয়সও এত অল্প ছিল না তখন।"

"কত ছিল বাবা?"

"পঁচিশ বছর।"

"তা হলে তো লুইয়ের চেয়েও বড় ছিলেন?"

"ওর কত হল? ১৮৪০ থেকে ১৮৬২? বাইশ বছর মাত্র?" তার পর বললেন, "আজ তোর জন্মদিন ত খুকী?"

"তাই ত লুই, ভুলেই গেছিলাম।"

"তাতে কি, জন্মদিনে কি খাসা উপহারটা দিলি বল তো?"—ওর মুখে হাসি ধরে না।

"হ্যাঁ, এর চেয়ে বড় উপহার জীবনে পাওয়া সম্ভব নয়" বলে লুই ওর ঘুমন্ত ছেলেকে আদর করল।

মার্গরিৎ স্বামীর হস্ত চুম্বন করল। তারপর খানিক বাদে প্রশ্ন করল, "লুই, ঠাকুমার কাছে তার করা হয়েছে?"

"ব্যস্ত হস না মা, আমি এখুনি তার করেই ফিরছি! কাপ্তেন সাহেবের কি অন্য দিকে মন দেবার মত অবস্থা ছিল?—কিন্তু তোর এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। কাল কথাবার্তা হবে। শুভরাত্রি মা। ভাল করে ঘুমিয়ে নে!" বলে উনি চলে গেলেন।

পরদিন সকালে সবার আগে ও জেগে উঠল। লুই সারারাত ঘুমুতে পারে নি, শরীর খারাপের জন্য নয়, উদ্বেগে। বিছানার দিকে পেছন ফিরে ও দাঁড়িয়ে ছিল চিমনীটার সামনে। নিজেরই কল্পনার নেশায় ও বুঁদ হয়ে ছিল, এমন সময় কানে এল রমণীয় সেই ডাক, "লুই!"

ও ঘুরে দাঁড়াল। মার্গরিৎ ওর দিকে পূর্ণ আস্থাভরা ডাগর দুটি চোখ মেলে চেয়ে ছিল। মাতৃত্বের দ্যুতি বিকীর্ণ হচ্ছিল ওর সারা মুখে। লুই এগিয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল।

"লুই তুমি ঘুমোও নি?"

"না, আমার ঘুমের দরকার নেই গো!"

"কে বলল নেই? যদি এভাবে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীন হও, মুস্কিলে পড়বে।"

"তা ত হল, তুমি কেমন আছ?"

"ড্রাগনের মত সুস্থ গো, আর অত্যন্ত সুখী!"

স্বামীর হাত নিয়ে খেলতে খেলতে ওর চোখে পড়ল বিয়ের আংটিটা। ও হাসল, "যখন তোমায় ওটা পরিয়েছিলাম, তখন মনে যে কত দ্বন্দ্ব ছিল!"

"আর আজ?"

ও স্বামীর হাতের উপর নীরবে মাথা রাখল। "আজ আমি সবচেয়ে সুখী, প্রিয়!"

ওদের আদরে ছেলেটা ঘুম ভেঙে যেতেই সে কিছু খুঁজতে লাগল। লুই বুঝতে পেরে মশারী ফেলে দিল, খুলে দিল একটা জানলা। ফিরে এসে দেখল মার্গরিৎ ওকে দুধ খাওয়াচ্ছে।

"ছোঁড়াটার খিদে পেয়েছে দারুণ!" হেসে জানাল মার্গরিৎ।

"খিদে ত না, একেবারে রাক্ষসের মত গিলছে। ওর দাঁত থাকলে মাকেও খেয়ে ফেলত বোধ হয়", ঠাট্টা করল লুই।

ছেলেটা আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে বাপের দিকে তাকাল, যেন একটু হাসল।

"দেখছ লুই, এত গাল-মন্দ খেয়েও তোমার দিকে চেয়ে হাসছে, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই! ছেলের মত ছেলে!"

"মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা বেশী দুধ খায়, না গো?" লুই হেসে জিজ্ঞাসা করল।

"তা কি করে জানব? এই ত সবে একটা হল। না বাপু, ছেলেই ভাল।"

"আমারও সেই মত, কিন্তু আসছে বার, বছর খানেকের মধ্যেই জন্ম নেবে ছোট্ট একটি খুকী,—ঠিক তোমার মত দেখতে।"

"বছর খানেকের মধ্যে?" ব্যথার ছাপ ফুটে উঠল ওর মুখে। অল্পক্ষণ পরে ও আত্মস্থ ভাবে বলল, "আমার স্বপ্নের কথা?"

"তোমার স্বপ্ন? পাগলী কোথাকার! স্বপ্নের কথা কেউ বিশ্বাস করে?" বলে ওর গাল টিপে দিল।

মার্গরিৎ তবু বিষম ভাবে মাথা নাড়ল, "আমি বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু আমার এই স্বপ্ন যে অন্য রকম।"

"কিন্তু আর তো ভয়ের কিছু নেই। প্রসবের সময়টাই আশঙ্কা-জনক। তুমি সগৌরবে পুরস্কার হাতে বেরিয়ে এসেছ সে পরীক্ষা থেকে।" বলে ও ছেলের মাথায় হাত রাখল।

"তোমার কি মনে হয় সব বিপদ কেটে গেছে লুই?" আশায় আনন্দে ওর চোখ জ্বলে উঠল।

"নিঃসন্দেহে, মার্গরিৎ।"

লুই-এর কথা ও পরম বিশ্বাসে মেনে নিল, বড় আশ্বস্ত হল।

"লুই, বাইবেল থেকে কিছু পড়ে শোনাও না।" ও আবদারের সুরে বলল।

না ভেবে-চিন্তে বইটা খুলেই ও পড়তে শুরু করল যা প্রথম চোখে পড়ল। সেটি ১১৪ নম্বরের স্তোত্র:—

—"ভগবানকে আমি ভালবাসি; তিনি আমার ক্ষীণকণ্ঠ শুনতে পাবেন।

—"তিনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন; সারা জীবন ধরে প্রতিদিন তাঁকে আমি স্মরণ করব।

—"মৃত্যুর ব্যথা আমায় ঘিরে ধরেছে; কবরের ভীতি আমায় আকুল করে তুলেছে।

—"অপরিসীম যন্ত্রণার মুখোমুখা দাঁড়িয়েছি আমি, ডেকেছি তোমায় হে ভগবান!

—"ভগবান আমার আত্মাকে মুক্তি দাও; তুমি, তুমি ভগবান

করুণাময়, সুবিচারক ; তুমি দয়াময়।

—"ভগবান সন্তানদের রক্ষা করেন ; বড় অবজ্ঞা সহ্য করেছি, তাই তিনিই আমায় উদ্ধার করেছেন।

—"হে আত্মা, স্বীয় শান্তি-লোকে প্রবেশ কর, ভগবান তোমায় সব কিছু দান করেছেন।

—"তিনি মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করেছেন আমার আত্মাকে, অশ্রু মুছে দিয়েছেন আমার নয়নের, সর্ব পতন থেকে আমায় বাঁচিয়েছেন।

—"এই মরলোকে আমি তাঁরই প্রীত্যর্থে বেঁচে থাকব।"

ওর পড়া শেষ হলে মার্গরিৎ আওড়াতে লাগল, "মৃত্যুর ব্যথা আমায় ঘিরে ধরেছে···ভগবানকে আমি স্মরণ করেছি। ভগবান, আমার আত্মাকে উদ্ধার কর।" তারপর ওর ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল ধীরে ধীরে, "চিরন্তন তাঁর সন্তানদের রক্ষা করেন ; তিনি আমাদের একেও দেখবেন, না গো ?'

"হ্যাঁ গো।"

সারাদিন ও বেশ হাসি-খুশী ছিল। ১৬ তারিখ সন্ধ্যা নাগাদ ও ঘুমিয়ে পড়ল। ডাক্তার এসে ও ঘুমোচ্ছে দেখে পরে আসবেন বলে চলে যাচ্ছিলেন ; হঠাৎ সেই সময় ও জেগে উঠে শঙ্কিত হয়ে তাকাতে লাগল।

"কি হল মা ?"

"ভয়!" ও বলল দারুণ বিচলিত ভাবে। ওর দুই চোখে অস্বাভাবিক একটা ছায়া।

"ভয় ?" ডাক্তার হেসে উঠলেন, "যা, যা! ভয় কিসের মা ?"

ও স্বামীর কাঁধে হাত রাখল। "বেশ কিছুক্ষণ ঘুমিয়েছি, না লুই ?"

"হ্যাঁ গো!"

"আবার সেই স্বপ্ন দেখেছি গো," অসম্ভব শঙ্কিত ওর চাউনি।

"হো, হো! স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছ বাছা ?" ডাক্তার বললেন,

"তোমার ছেলে যদি জানে তার মা এমন ভীতু, কি ভাববে বল তো? এই নাও, এটুকু খেয়ে নাও দেখি," বলে এক কাপ দুধ এগিয়ে দিলেন ওর মার হাত থেকে নিয়ে। এক চুমুকে ও সবটা খেয়ে নিল।

"এখন ভাল লাগছে না?" বলে ডাক্তার উপদেশ দিলেন, "এই সব খারাপ চিন্তাগুলো দূর করে দাও মা; এ দুর্বল অবস্থায় ভয় পাওয়া ঠিক নয়; এমন যে কত দেখলাম—প্রথম মা হয়ে সবাই এই রকম নানা উদ্ভট চিন্তায় আকুল হয়ে ওঠে; ভাল করে ঘুমোও মা-মণি, বঁ সোয়ার।"

লুই ওঁর সঙ্গেই বেরিয়ে গেল, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ডাক্তার মাথা নাড়লেন, "অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে পড়েছে; রাতে জ্বরটা বাড়বে; এক দাগ ওষুধ দিও।"

"আর আশা নেই ডাক্তারবাবু?" নিচু নীরস গলায় কাপ্তেন জানতে চাইল।

"উঁহু, সে-কথা বলছি না, হয়ত ভাল হয়ে যাবে, অসম্ভব কিছু নয়; কিন্তু যা ভয় করছিলাম, ঠিক তাই হল: জ্বরটা—"

উনি নিচে গিয়েই দ্রুতপদে উঠে এলেন; দেখলেন সিঁড়ির রেলিং-এ মাথা রেখে দাঁড়িয়ে আছে লুই। অন্তরঙ্গের মত উনি ওর পিঠে হাত রাখলেন। লুই চমকে উঠল; ওঁকে দেখে বলল, "ওঃ, আপনি।"

"আমি বলতে এলাম যে ও যেন বাচ্চাটাকে আর দুধ না খাওয়ায়; একটি দুধ-মা পাঠাচ্ছি; নয়ত বাচ্চাও অসুখে পড়বে। সবচেয়ে সতর্ক থাকতে হবে, ও যেন বিপদের বিন্দুমাত্র আভাস না পায়। তবে ও একদম ভেঙে পড়বে।"

তারপর লুইয়ের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, "আর মঁসিয়, এ-ভাবে মুষড়ে পড়ো না; ভয়ের বিশেষ কিছুই দেখছি না। শতকরা পাঁচটি মৃত্যুও হয় না এ-সব কেস-এ। জ্বরটা একটু মুস্কিলজনক বটে, কিন্তু কোন্ অসুখটা না শুনি? আচ্ছা বাবা আসি; বঁ সোয়ার।"

লুই প্রসূতির ঘরে গিয়ে ঢুকল। মা মেয়েতে কথা হচ্ছিল। ওর

ম্লান কপোলে লেগেছে গাঢ় লালের ছোপ, আর চোখ দুটো চকচক করছে ; দারুণ আবেগের সঙ্গে ও কথা বলছিল, নিচু গলায় অবশ্য, কারণ পাশেই ওর ঘুমন্ত শিশু। স্বামীকে আসতে দেখে ও তার দিকে ফিরে তাকাল।

"মার্গরিৎ !"

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ও ইশারা করল যে বাচ্চাটা ঘুমুচ্ছে। লুই হেসে ওর পাশে গিয়ে বসল।—"ওগো, কথা একটু কম বললেই পারতে এ-সময়ে ; ক্লান্ত হয়ে পড়বে যে, শরীর খারাপ হবে।"

এমন সময় তেরেস এল ; দরজটা ক্যাঁচ করে উঠতেই বাচ্চাটার ঘুম ভেঙে গেল।

"দেখলি তেরেস, তুই বাছার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলি !" একটু ধমকের সুরে ও বলল। তারপর বাচ্চাকে কোলে নিয়ে চপল হাসিতে মুখর হয়ে বলল, "বাবু আমার হয় ঘুমুবেন, নয় খাবেন ; আলসে কোথাকার !"

ও ছেলেকে দুধ খাওয়াতে যাচ্ছিল, এমন সময় ধীরে ধীরে ওর তপ্ত হাতে হাত রাখল লুই।

"শুনছ, ওকে দুধ দিও না।"

সবিস্ময়ে চেয়ে মার্গরিৎ প্রশ্ন করল, "কেন ?"

"তোমার অল্প জর হয়েছে কি না, তাই জরের ঘোরে ওকে যদি দুধ দাও, ওর শরীর খারাপ হবে। জর ছাড়লেই আবার খেতে দিও, কেমন ?"

শান্ত উৎফুল্ল কণ্ঠেই কথা কটি লুই বলল। কিন্তু ওর বুক ফেটে যেতে লাগল, যখন দেখল কেমন ভাবে মার্গরিৎ করুণ দৃষ্টিতে এক মনে শুনছে ওর কথা।

"বেচারা !" বলে সখেদে ও চোখ বন্ধ করল। পরে বাচ্চাকে আদর করতে গিয়ে দু ফোঁটা জল তার মুখের ওপর পড়ল ; তাড়াতাড়ি

সেটা মুছে দিলেও ওর স্বামীর চোখ তা এড়ায় নি। সে সস্নেহে বালিকা-বধূর মাথায় হাত রাখল। খানিক বাদেই ও চোখ তুলে চাইল। এমন ভাব দেখাল যেন পরম শান্তিতে বিশ্রাম করছে।

"কিন্তু বাচ্চাটার খাবার কি হবে?"

"মঁসিয় শাঁতো এখুনি দাই পাঠাবেন বলে গেলেন।" বলেই ও জুড়ে দিল, "দু-তিন দিনের ব্যাপার।"

সারা সন্ধ্যা জ্বরের ঘোরে কাটল; তবু মুখে টুঁ শব্দটি নেই। ও প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল, ওর যন্ত্রণা দেখে স্বামী যেন উদ্বিগ্ন না হয়।

দাই এলে মার্গরিৎ তাকে ভাল করে দেখল। মার্গরিতের চেনা লোক, স্যার রিকার; বড় ভাল মানুষ। তিন ছেলের মা। মার্গরিৎ ওর হাতে টান দিল, "আচ্ছা তোমার দুধ ভাল ত বাছা, বলকারক বেশ, না?"

"আজ্ঞে, মাদাম, তুমি ত আমার বড় ছেলে দুটিকে দেখেছ—কেমন সণ্ডা-গণ্ডা। ছোটটিও ওই ধরনের, বছর খানেক বয়স বল, লোকে দেখে ভাবে দুই বছরের ছেলে। জান ত, এর আগে এ কাজ আমি করি নি; কিন্তু মা, ডাক্তার বাবু ওদিকে যখন গেলেন দুধ-মার খোঁজে, আর জানালেন যে তোমার ছেলের জন্য দরকার, আগুপিছু না ভেবেই আমি এগিয়ে গেনু: 'ডাক্তারবাবু, আমার স্বাস্থ্য খুবই ভাল, গায়ের কম জোর ধরি না। আমায় নেবেন?' উনি তখুনি রাজী, 'হ্যাঁ, স্যার রিকার, তুমি বড় ভাল মানুষ', উনি বললেন। কিন্তু আমি বাধা দিনু, 'মনে নেই ডাক্তারবাবু, উনিই ত একবার আমার গিওম্‌কে রক্ষে করেছিলেন ও ডুবে যাচ্ছিল যখন?"

মার্গরিৎ চাষী বৌয়ের দিকে চেয়ে দেখল, ও ঝাড়নের খুঁটে চোখ মুছল।

"বাচ্চাটাকে দেখাবে মা?"

ওর হাতে ছেলে দেবার সময় হাজার রকম আবোল-তাবোল

উপদেশ দিল মার্গরিৎ। ছেলেকে কি ভাবে যত্ন করতে হয় তার বিবরণ অনভিজ্ঞ বালিকার মুখে শুনে দাই ত হেসে বাঁচে না। মার্গরিৎ স্বামীর সঙ্গে বসে দেখছিল ওর বাচ্চার খাওয়া। বহুক্ষণ ধরে দাইয়ের বুকের দুধ খেয়ে ছেলেটা তার কোলেই ঘুমিয়ে পড়ল, মার্গরিতের চোখ জলে ভেসে গেল। ওর স্বামী ওর মুখ তুলে নিয়ে চুমা যখন দিলে, মার্গরিৎ তার হাত ধরে নিরাশার সুরে বলল, "দেখ, আমি যখন থাকব না, বাচ্চাটা আমায় একদম ভুলে যাবে!"

সারারাত ঘুমুতে পারল না ও, শেষে অনুরোধ করল বাচ্চার বিছানা ওর বিছানার ধারে এনে রাখতে। লুই ভেবেছিল ও ঘুমিয়ে পড়েছে, তাই একটা কৌচের ওপর শুয়ে একটু হাত-পা ছড়িয়ে নিচ্ছিল, আর এক ভাবে তাকিয়েছিল ওর স্ত্রীর দিকে। মার্গরিৎ তার ছেলের দিকে ঝুঁকে কি দেখছিল, লুইয়ের দীর্ঘশ্বাস শুনে ও ফিরে তাকাতেই লুই প্রশ্ন করল, "কি গো তুমি এখনও ঘুমোও নি? করছ কি?"

"ছেলেটাকে দেখছি।"

"এখন ঘুমিয়ে নিলেই ভাল করতে, ছেলেকে দিনের বেলায় দেখতে!"

"কিন্তু তার আগেই যদি মরে যাই?" আত্মস্থ ভাবে মার্গরিৎ ফিস ফিস করে বলল।

"পাগলী কোথাকার," লুই এসে ওকে জড়িয়ে ধরল, "দিনরাত তুমি খালি মৃত্যু-চিন্তাই করবে?"

"জান না তোমায় ছেড়ে যেতে কী কষ্টই হচ্ছে, নবাগত অতিথিকেও ছাড়তে বুক ফেটে যাচ্ছে, তবু—"

"তবু কি? কে তোমায় যেতে দিচ্ছে? ভগবান? আমার হাত থেকে যমরাজ স্বয়ং এসেও তোমায় ছিনিয়ে নিতে পারবে না মার্গো।" দৃঢ়কণ্ঠে ও দাঁত চেপে বলল, কম্পিত ওষ্ঠ দিয়ে স্পর্শ করল মার্গরিতের ওষ্ঠ। শূন্য দৃষ্টিতে মার্গরিৎ হাসল।

"লুই, প্রিয়তম!" ওর কপালের চুলগুলি সরাতে সরাতে আবেশের

স্বরে মার্গরিৎ ডাকল।

লুই উঠে ওকে ঘুমের ওষুধ দিল।

জ্বর পুরোপুরি না ছাড়লেও ১৭ তারিখ সকালে ওকে অনেক সুস্থ লাগল। ডাক্তার যখন এলেন, ও তার স্বাভাবিক হাসিতে তাঁকে আপ্যায়িত করল। প্রথমেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আজ ছেলেকে দুধ খাওয়াতে পারবে কি না। ডাক্তার হাসলেন, "তুমি মা বড় অধীর হয়ে উঠেছ দেখছি ; আগে নাড়ী দেখি তারপর ছেলের কথা।—বাঃ যাদু বেশ বুঝেছেন ওর কথা হচ্ছে," বলে বাচ্চাটাকে উনি আদর করলেন। মার্গরিতের নাড়ী দেখে উনি একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন, "তোমার জ্বর এখনও ছাড়ে নি মা ; ছেলেকে এ অবস্থায় দুধ খাওয়ানো ঠিক হবে না।" রোগিণীর ভাব পরিবর্তন দেখে উনি সান্ত্বনা দিলেন, "সেরে ওঠ মা, তারপর যত খুশি দুধ খাইও, কেমন ?"

"তা আর আমার ভাগ্যে নেই ডাক্তারবাবু !" ওর মুখে অদ্ভুত করুণ হাসি খেলে গেল। শিশুর কপালে মুখ রেখে ও বলল, "ভগবান তোকে দেখবে বাপ, তোর বাবা থাকবে, কিন্তু মা থাকবে না রে, মা থাকবে না।"

ফিরে তাকাতেই যখন দেখল ওর স্বামী মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিজেকে সংযত করতে, তাড়াতাড়ি মার্গরিৎ জোর করে হেসে বলল, "আমি বড বাড়াবাড়ি করছি না গো ? একটুখানি জ্বর হয়েছে আর ধরে রেখেছি যে আমি মরতে বসেছি।" লুইয়ের কাঁধে ও হাত রাখল।

"নাও বাপু তুমিই ত এখনও কালো প্রজাপতির পেছনে পেছনে ছুটছ, আমারগুলো কত সহজে তাড়িয়ে দিলাম দেখ তো ? কেন কষ্ট পাচ্ছ ? আমি মরব না লুই, মরতে চাই না। হল ত ? আচ্ছা মঁসিয় শাঁতো এত অল্প বয়সে, এমন খাসা স্বাস্থ্য থাকলে কেউ কখনও সামান্য জ্বরে মরতে পারে ?"

"মোটেই না, মোটেই না। তোমায় দেখে বড় আশ্বস্ত হলাম মা ; সব

সময় প্রফুল্ল থাকতে চেষ্টা কর ; কালকেই তা হলে জ্বর ছেড়ে যাবে !"

আবার আসবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন। বিকাল চারটে নাগাদ জ্বর বাড়ল ; ওর বাবা এসে দেখলেন প্রলাপ শুরু হয়েছে।

"বাবা, বস এখানে !" সামনের চেয়ার দেখিয়ে ও বলল, "আমি সেরে উঠব, না বাবা ? আর একটু সেরে উঠলেই আমরা দক্ষিণ দেশে যাব, নীসে।"

তারপর স্বামীকে বলল, "সেই ছোট্ট বাড়িটা আবার ভাড়া নেব, কেমন ? সেখানেই ত আমাদের নতুন অতিথির কথা প্রথম আলোচনা করি আমরা। আবার যাব ত নীসে ? বল না গো ?"

হঠাৎ দারুণ শঙ্কায় চেঁচিয়ে উঠল,"কই ? ও কই ? আমার ছেলে আমায় ফিরিয়ে দাও !" বিছানায় ও উঠে বসল।

"এই ত তোমার ছেলে, তোমার পাশেই রয়েছে ; কেন মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছ ?" ওকে শুইয়ে দিয়ে লুই ছেলেকে রাখল ওর পাশেই।

"বাছার খিদে পেয়েছে গো", বলেই ও জামার বোতাম খুলতে গেল। লুই সন্তর্পণে বাধা দিল।

"মার্গো, ডাক্তার তোমায় মানা করে গেছেন না ওকে দুধ দিতে ?"

"কেন ?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করল মার্গরিৎ, কারণ জ্বরের ঘোরে ওর কিছুই মনে ছিল না।

"তোমার যে অসুখ করেছে।"

"অসুখ ?" ও চমকে উঠল।

"হ্যাঁ, গো।"

"তেমন বাড়াবাড়ি নয়, না প্রিয় ? সেরে উঠব'খন। বল তো লুই, শীগগির আমি সেরে উঠব, তাই না ? কাল ?" ব্যথাভরা কণ্ঠে ও প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ"—দু-একটার বেশী কথা লুই বলতে পারছিল না। ইতিমধ্যে ডাক্তারকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল ; তিনি এলেন।

"ডাক্তারবাবু, আমি মরতে চাই না, আমি সেরে উঠব। লুইয়েরও

তাই মত ; ও সত্যি কথাই বলে।"

মঁসিয় শাঁতো ওর নাড়ী দেখলেন।

"কেমন দেখছেন ? আমার জ্বর তেমন নেই, না ?"

"সামান্য আছে ; তোমার এখন ঘুমোতে চেষ্টা করা উচিত মা, একটা ঘুমের ওষুধ দেব।"

"তা হলেই ঘুম হবে ?"

"হ্যাঁ মা।"

"সারারাত ?"

"নিশ্চয়ই !"

"আর সকালে উঠে দেখব সেরে গেছি, না ?"

"একদম সেরে উঠবে না, তবে দেখবে অনেক তাজা লাগছে শরীরটা।"

উনি প্রেসক্রিপশন লিখতে বসলেন ; ওষুধের দোকানে লোক গেল ; ও ওষুধ খেল ; তন্দ্রা এল ; ঘুমিয়ে পড়ল। ওর স্বামী আর মঁসিয় শাঁতো ওর পাশে বসে রইলেন। ওর বাবা আর মা-ও ছিলেন। দম নিতে ওর যেন কষ্ট হচ্ছে, গা পুড়ে যাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়লেও ও ছটফট করতে লাগল বিছানার ওপর। সবাই চুপ করে বসে রইলেন। খবরের কাগজ হাতে মঁসিয় শাঁতো বসেছিলেন, ঘন ঘন তির্যক দৃষ্টিতে রোগিণীর অবস্থা লক্ষ্য করছিলেন। ওর মা ছেলেটাকে দোল দিচ্ছিলেন, বাপ কাতর নয়নে চেয়ে ছিলেন প্রাণতুল্য কন্যার দিকে, তাঁর একমাত্র সন্তানের দিকে। ওর স্বামীর দিকে চেয়ে তিনি দেখলেন, তার মুখ অব্যক্ত যন্ত্রণায় কালো হয়ে উঠেছে। নতজানু হয়ে ও বসেছিল স্ত্রীর শয্যার পাশে, থেকে থেকে ক্লান্তিতে, অবসাদে মাথাটা নামিয়ে রাখছিল তার বালিশে। হাতের মুঠোয় ধরা ছোট্ট তপ্ত হাতটি ও থেকে থেকে চুমায় ভরে দিচ্ছিল, ঘুমিয়ে পড়ার আগে মার্গারিৎ স্বামীর হাতে ওই ভাবে হাত রেখেই শুয়েছিল। সকাল প্রায় ছটা নাগাদ, যখন পুবের আকাশ

সাদা হয়ে এল, মার্গরিৎ চোখ খুলে উঠে বসল।

"লুই কই? আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি না ত?" লুই যে ওকে ধরে বসেছিল, তা ও বুঝতে পারে নি।

লুই তাড়াতাড়ি সরে বসল।

"এই ত বন্ধু, কোথায় ছিলে?" শিশুসুলভ হাসিতে ও ঝলমল করে উঠল। শীর্ণ দুটি হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল মার্গরিৎ। তার পর আবার শুয়ে পড়ল বিস্ফারিত নেত্রে।

"লুই, ছেলেটা কই?"

বহুক্ষণ ছেলের মুখের দিকে চেয়ে মার্গরিৎ তার মুখে চুমা দিল।

"বাছা রে, ঘুমিয়ে আছিস? যাবার বেলা ভেবেছিলাম তোর স্বচ্ছ চোখ দুটি দেখে যাব। যাক, ক্ষোভ নেই সে-জন্যে। ওকে দোলনায় শুইয়ে দাও গো! দেখ যেন জেগে না ওঠে।"

কাপ্তেন ছেলেকে দোলনায় রেখে এলে, তরুণ পিতার হাত দুটি চেপে ধরল মার্গরিৎ পরম সুখে।

"বন্ধু, বড় অন্ধকার, আর একটু কাছে এস, আরও কাছে, আরও" দারুণ আবেগে জড়িয়ে ধরল ও স্বামীর হাত।

"উঃ, বড় ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত," ও বিড় বিড় করে বলল, "কি ঘুমটাই পাচ্ছে, প্রিয়, প্রিয়তম, এ ঘুমের আগে আমায় টেনে নাও, বুকে টেনে নাও।"

লুই ওকে বুকে টেনে নিল।

"ভগবান আমাদের মঙ্গল করুন।" মার্গরিৎ বলল।

ঘুমের আগে ছোট বেলা থেকেই এ প্রার্থনা ও করে এসেছে। ওর চোখ বন্ধ হয়ে গেল, ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক হয়ে গেল, সেখান দিয়ে উড়ে গেল ওর সুনির্মল আত্মা ভগবানের বিশাল সত্তার পানে, আর মার্গরিৎ আচ্ছন্ন হয়ে রইল পৃথিবীর ঘুমে।

সমাপ্ত

"......অসাধারণ এক তারুণ্যের প্রতিভা নিয়ে জন্মালেন তরু দত্ত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিদেশী ভাষার উপর দিয়েই সে প্রতিভার অযথা অপব্যয় ক'রে অকালে তিনি অল্পবয়সেই মারা গেলেন। তিনিও শিখেছিলেন গ্রীক ভাষা। ইংরেজী ভাষাতে তিনি খুবই চমৎকার লিখতেন, কিন্তু ফরাসীতেও তাঁর কম দক্ষতা ছিল না। তাঁর লেখা ফরাসী নভেল ওই দেশের লোকেরা খুব আদরের সঙ্গে পড়ত, আর তাঁর লেখা অপূর্ব ফরাসী সঙ্গীত তখন জার্মানীর বিরুদ্ধে ফরাসী জাতির মনে উদ্দীপনা যোগাত। এঁদের প্রত্যেকেরই প্রচুর পড়াশোনার বিষয়ে যেমন একটা অসাধারণত্ব ছিল, এঁদের জীবন-ব্যাপার সম্বন্ধেও ছিল তাই। যাকে বলে মস্ত বহরের মানুষ, এঁরা ছিলেন ঠিক তাই,—যা কিছু করতেন সবই বেশি বেশি মাত্রায়। এঁরা শিখেছেনও যত বেশি, লিখেছেনও তত বেশি।"

—শ্রীঅরবিন্দ